ফেলুদা সমগ্র

জয় বাবা ফেলুনাথ

সত্যজিৎ রায়

BENGALIEBOOK.COM
2021
বেঙ্গলিইবুক.কম
bengaliebook.com

সূচিপত্র

১. লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু........................ 2
২. নিরঞ্জনবাবুর ঘরে বসে........................... 13
৩. ভুবনেশ্বরের যক্ষীর ভাঙা মাথা...................... 23
৪. ক্যালকাটা লজের ঠাকুর.......................... 32
৫. আমরা কাশীতে এসেছি........................... 46
৬. জয় ধাবা বিশ্বনাথ.............................. 58
৭. দশাশ্বমেধ ঘাট............................... 71
৮. আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে.......................... 80
৯. গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেব.......................... 90
১০. দশাশ্বমেধে আজ দাসেরা......................... 98
১১. বিজয় দশমী................................ 107

১. লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু

রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু প্লেট থেকে একটা চীনাবাদাম তুলে নিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে সেটার উপর একটা হালকা হুঁশিয়ার চাপ দিতেই ব্রাউন খোলসের মধ্যে থেকে মসৃণ ফরসা বাদামটা সুড়ুৎ করে বেরিয়ে তাঁর বাঁ হাতের তেলোর উপর পড়ল। সেটা মুখে পুরে খোসাটা সামনের টেবিলে রাখা অ্যাশ-ট্রেতে ফেলে দিয়ে হাত ঝেড়ে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, দেশাশ্বমেধ ঘাটে বিজয়া দশমী দেখেছেন কখনও?

ফেলুদার সামনে দাবার বোর্ড, তার উপরে একটা সাদা রাজা, একটা সাদা গজ আর একটা সাদা বোড়ে, আর একটা কালো রাজা আর দুটো কালো ঘোড়া। বোর্ডের পাশে গ্রেট গেমস অফ চেস বলে একটা বই খোলা; ফেলুদা তার মধ্যে থেকে একটা চ্যাম্পিয়নশিপ গেম বেছে নিয়ে তার চালগুলো বই দেখে দেখে চলিছিল। খেলার প্রায় মাঝামাঝি লালমোহনবাবু এসে পড়েন। আজকাল আর ওঁর সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকম ভদ্রতা না করলেও চলে, তাই ফেলুদা শ্রীনাথকে চা আনতে বলে খেলাটা শেষ করে নিচ্ছিল, আর চালের ফাঁকে ফাঁকে লালমোহনবাবুর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। এ-প্রশ্নটার জবাবেও সে বই থেকে চোখ না তুলেই বলল, উঁহু।

ওঃ-সে যা ব্যাপার না। সে এক, যাকে বলে, জমজমাট ব্যাপার। সে মশাই আপনি না। দেখলে ইয়েই করতে পারবেন না।

ফেলুদা খেলার শেষ চালটা চেলে বোর্ডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি কি আমায় লোভ দেখাবার চেষ্টা করছেন?

তা কতকটা ঠিকই ধরেছেন, হেঃ হেঃ!

কিন্তু আপনি যে-ভাবে বর্ণনা করলেন তাতে আপনার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কেন?-লালমোহনবাবুর ভুরু দুটো নাকের উপর জুড়ে গিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেট হয়ে গেল।

ফেলুদা বোর্ড ভাঁজ করে খুঁটিগুলো বাক্সে ভারতে ভরতে বলল, কারণ কোনও ঘটনা বা দৃশ্য সম্পর্কে কেবলমাত্র জমজমাট বিশেষণটা ব্যবহার করলে আসলে কিছুই বলা হল না। ওতে চোখের সামনে কোনও ছবি ফুটে ওঠে না, ফলে দশাশ্বমেধে বিজয়া-দশমীর বিশেষত্বটা কিছুই বোঝা যায় না, আর তার ফলে ফেলুমিত্তিরের মনে কোনও সাড়া জাগে না। আপনি উপন্যাস লেখেন, আপনার বর্ণনা এত দায়সারা হবে কেন?

ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন, লালমোহনবাবু জিভ কেটে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন। আসলে প্রায় পচিশ বছর হয়ে গেল তো, তাই ডিটেলগুলো সব মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে গেছে। তবে দশাশ্বমেধে ভাসান দেখে চাে্খ-কান ধাঁধিয়ে গোসূল এটা বেশ মনে আছে।

ওইতো-চোখ এবং কান। বর্ণনায় ওই দুটোর জন্য খোরাক চাই, সম্ভব হলে নাকও।

নাক –লালমোহনবাবুর ভুরু দুটো উপর দিকে উঠে এক জোড়া খিলেন হয়ে গেল।

সম্ভব হলে।..কলকাতার রাস্তাঘাটে এমনিতে কোনও যে বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায় তা না। লেক মার্কেটের কাছে বিকেলের দিকটা বেলফুলের গন্ধ, বা নিউ মার্কেটের পশ্চিম দিকে বাট্রাম স্ট্রিটের কোনও বিশেষ অংশে শুটকি মাছের গন্ধ, হাসপাতালের কাছে ডিসাইনফেক্টন্টের গন্ধ, শ্মশানের কাছে মড়া পোড়ার গন্ধা—এই সবই নিশ্চয় লক্ষ করে থাকবেন। তেমনি কাশীর, বর্ণনাতেও কিছু কিছু গন্ধের উল্লেখ না করলে কি চলে? বিশ্বনাথের গলিতে ধূপ ধুনো গোবর শ্যাওলা লোকের ঘাম মেশানো গন্ধ, আবার গলি ছেড়ে বাইরে এসে বড় রাস্তা দিয়ে ঘাটের দিকে হাঁটার সময় কিছুক্ষণ প্রায় একটা নিউট্রাল গন্ধহীন অবস্থা, আবার ঘাটের সিঁড়ি যেই শুরু হল অমনি ধাপে ধাপে একটা উগ্র গন্ধ ক্রমে বেড়ে গিয়ে প্রায় পেটের ভাত উলটে আসার অবস্থা। সেটা যে ওই বোকাপাি্ঠাগুলোর গা থেকে বেরোচ্ছে সেটা যে না জানে তার বুঝতে কিছুটা সময়

লাগবে। তারপর ছাগলগুলোকে পিছনে ফেলে একটু এগোলেই পাবেন একটা গন্ধ যাতে জল মাটি তেল ঘি ফুল চন্দন ধূপ ধুনো সব একসঙ্গে মিশে রয়েছে।

তার মানে আপনি বেনারস গেছেন, মন্তব্য করলেন জটায়ু।

গেছি। তখন কলেজের ছাত্র। হিন্দু ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে গেসলাম।

লালমোহনবাবু পকেট হাতড়াচ্ছেন দেখে ফেলুদা বলল, আপনি যে কাগজের কাটিংটা খুঁজছেন, সেটা আপনি ঘরে ঢোকার আধ মিনিটের মধ্যে আপনার পকেট থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে এখন ওই টেলিফোনের টেবিলের পায়ায় লটকে আছে।

এঃ হে-রুমালটা বার করার সময়...

লালমোহনবাবু ওঠার আগেই আমি কাগজটা তুলে ওঁর হাতে এনে দিলাম। ফেলুদা বলল, ওটা সেই কালকের খবরটা তো? কাশীর সেই সাধুবাবার ব্যাপার?

লালমোহনবাবু ভারী ব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনি জানেন, তবু এতক্ষণ কিছু বলেননি? কী রহস্যজনক ব্যাপার বলুন তো।

আমি লালমোহনবাবুর হাত থেকে কাটিং-টা নিয়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে-

বারাণসীর মছলি-বাবা

বারাণসীতে গত বৃহস্পতিবার এক সাধুবাবার আবির্ভাব শহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে বলে জানা গেল। অভয়চরণ চক্রবর্তী নামক বাঙালিটোলার জনৈক প্রবীণ বাসিন্দা কেদার ঘাটে প্রথম সাধুবাবার সাক্ষাৎ পান, এবং অচিরেই তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পান। সাধুবাবা আপাতত শ্রীচক্রবর্তীর গৃহেই অবস্থান করছেন। ভক্তগণের নিকট ইনি মছলি-বাবা নামে পরিচিত। তাঁরা বলেন, বাবাজী নাকি প্রয়াগ থেকে গঙ্গাবক্ষে ভাসমান অবস্থায় বারাণসীতে এসে পৌঁছেছেন।

এ-ধরনের সাধুবাবার কথা আজকাল এত শোনা যায় যে আমার কাছে খবরটা তেমন একটা কিছু বলে মনে হল না। কিন্তু লালমোহনবাবু দেখলাম ভয়ংকরীভাবে মেতে উঠেছেন। বললেন, হয়তো সেই একেবারে তিব্বতে গঙ্গার সোর্স থেকে ভাসা শুরু করেছেন। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

গঙ্গার সোর্স তিব্বতে এ খবর কে দিল আপনাকে?

ও হা হে, সরি-ওটা বোধহয় ব্রহ্মপুত্র! যাই হোক-তিব্বত না হোক হিমালয় তো! তাই বা কম কীসে?

আপনার কি তাকে দর্শন করার ইচ্ছে জেগেছে?

যেমন-তেমন সাধু হলে হত না, কিন্তু এর মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন না আপনি? মছলি-বাবা-নামটাই তো ইউনিক।

ফেলুদা তত্ত্বপোশ থেকে উঠে পড়ল। নামটা মন্দ হয়নি সেটা স্বীকার করছি। খবর পড়ে ওই একটি জিনিসই মনে দাগ কাটে, আর কিছু নয়। কাশী যদি যেতেই হয় তো মছলি-বাবার জন্য নয়। কচৌরি গলির হনুমান হালুইকরের রাবাড়ির স্বাদ এখনও মুখে লেগে রয়েছে। ও জিনিসটা তো কলকাতার বাজার থেকে উঠেই গেছে।

আর ধরুন যদি গিয়ে দেখেন যে হালুইকরকে কোনও অজ্ঞাত আততায়ী খুন করে গেছে–তার রাবডির রসে রক্তের ছিটে পড়ে রস গোলাপি হয়ে গেছে–তা হলে তো কথাই নেই। কাশীও হল, কেস ও হল, ক্যাশও হল–হাঃ হাঃ। এক ঢিলে তিন পাখি। আপনি তো বেশ কিছুদিন বসে, তাই না?

কথাটা ঠিকই। মাস তিনেক হল ফেলুদার হাতে কোনও কাজ নেই। অবিশ্যি তার একটা কারণ আছে, আর সেটা আমি এর আগেও বলেছি। ফেলুদা বলে একটা ক্রাইমের পিছনে যদি কোনও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ক্রিমিন্যালের কারসাজির ছাপ না থাকে, তা হলে সে-ক্রাইমের

কিনারা করতে বিশেষ মাথা খাটানোর প্রয়োজন হয় না, আর মাথা না খাটাতে পারলে ফেলুদার তৃপ্তি হয় না। কাজেই কেস মামুলি বুঝতে পারলে সে বেশির ভাগ সময়ই মক্কেলকে ফিরিয়ে দেয়।

এক কথায় ফেলুদা চায় তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিটাকে শানিয়ে নেবার সুযোগ। সে সুযোগ গত তিন মাসের মধ্যে আসেনি। এই অবসরে অবিশ্যি ফেলুদা অজস্র বই পড়েছে, নিয়মিত যোগব্যায়াম করেছে, সিগারেট খাওয়া কমিয়েছে, দাবা খেলেছে, দুবার চুল ছটিয়েছে, দুটো বাংলা, একটা হিন্দি আর পাঁচটা বিদেশি ছবি দেখেছে, এক'দিন আমাকে সঙ্গে করে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে বালিগঞ্জে আমাদের বাড়ি অবধি হেঁটে এসেছে এক ঘণ্টা সাতান্ন মিনিটে। এর মধ্যে একবার দাড়ি-গোঁফ রাখবে বলে সাতদিন শেভিং বন্ধ করে আট দিনের দিন আয়নায় নিজের চেহারা দেখে মত পালটিয়ে আবার পুরনো চেহারায় ফিরে গেছে।

লালমোহনবাবু বললেন, আপনার কেস নেই, আর আমার মাথায় গল্পের প্লট নেই। এই প্রথম পুজোয় আমার বই বেরোল না, জানেন তো? আগে তো এ-বই সে-বই থেকে এটা ওটা খামচে নিয়ে তার উপর কিছুটা রং চড়িয়ে যা হোক একটা কিছু খাড়া করে দিতাম; আপনার হাতে বার বার ধরা পড়ে চুরি বিদ্যে তো নো লংগার বড় বিদ্যে, তাই এখন নিজেরই মাথা খাটাতে হয়। ভাবছিলুম কলকাতার এই বদ্ধ আবহাওয়া থেকে বেরোতে পারলে বোধহয় ব্রেনটা কিছুটা খুলত।

যেতে পারি, তবে একটা রিস্ক আছে।

কী রিস্ক?

গিয়ে-টিয়ে শেষটায় আমিও কেস পেলাম না, আপনিও প্লট পেলেন না।

বেনারস গিয়ে লালমোহনবাবু গল্পের প্লট পেয়েছিলেন ঠিকই; তবে ফিরে আসার দুমাস পরে বড়দিনে তাঁর যে রহস্য উপন্যাসটা বেরোল, সেটার সঙ্গে টিনটিনের একটা গল্পের আশ্চর্য মিল।

ফেলুদার কিন্তু গিয়ে সত্যিই লাভ হয়েছিল। তা না হলে অবিশ্যি এ বইটাই লেখা হত না। ফেলুদার জীবনে সবচেয়ে ধুরন্ধর ও সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তাকে এই বেনারসেই লড়তে হয়েছিল। ও পরে বলেছিল-এই রকম একজন লোকের জন্যই অ্যাদ্দিন অপেক্ষা করছিলাম রে তোপসে। এ সব লোকের সঙ্গে লড়ে জিততে পারলে সেটা বেশ একটা

দশাশ্বমেধ ঘাটের রাস্তার উপর পঞ্চাশ বছরের পুরনো বাঙালি হোটেল ক্যালকাটা লজ। হাটেলের ম্যানেজার নিরঞ্জন চক্রবর্তী লালমোহনবাবুর গড়পারের প্রতিবেশী পুলক চ্যাটার্জির ভায়রা ভাই। পুলকবাবু আগে থেকে আমরা আসছি বলে জানিয়ে দেওয়াতে হোটেলে জায়গা পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি। অমৃতসর মেলে আমরা বেনারস পৌঁছলাম সকাল সাড়ে নটায়। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে আসতে আসতে হয়ে গেল দশটা।

ম্যানেজার মশাই নিজে তখন হোটেলে নেই, কিন্তু তার জায়গায় যিনি ছিলেন তিনিই, চাকর হারকিষণের হাতে আমাদের জিনিসপত্র উপরে পাঠিয়ে খাতায় আমাদের নাম-ধাম লিখিয়ে সই করিয়ে নিলেন।

দোতলায় গিয়ে দেখি ঘরে চারটে খাটিট। তার একটার নীচে একটা মাঝারি সুটকেস, আর যেমন-তেমনভাবে গুটিয়ে রাখা একটা হান্ড-অল। এ ছাড়া খাটের পাশে তাকে আর আলনায় কিছু জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় ইত্যাদি রয়েছে। ফেলুদা সেগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে চাপা গলায় বলল, নাসিক গর্জনে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না তো?।

কেন? কই, আপনার তো নাক ডাকে না।

আমার না; আমি আমাদের রুম-মেটের কথা বলছি।

সে কী মশাই, আপনি লোকটর ওই কটা জিনিসপত্র দেখেই–

সঠিক বলে বলছি না; এটা অনুমান-মাত্র। সাধারণত মোটা লোকেরাই নাক ডাকায় বেশি, আর ইনি যে শীর্ণকায় নিন। সেটাও এর শার্ট অ্যর প্যান্টের বহর দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তার উপরে ফেনস্কের শিশি থেকে অনুমান করা যায় যে এর মাঝে মাঝে নাক বন্ধ হয়ে যায়। সেখানেও নাক ডাকার একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

সর্বনাশ!–আরও কিছু বুঝলেন নাকি?

তাকের উপর প্রসাধনের জিনিসের মধ্যে শেভিং-এর সরঞ্জামের অভাবটা অর্থপূর্ণ নয় কি? অবিশ্যি যদি ইনি মাকুন্দ হয়ে থাকেন তা হলে আলাদা কথা, না হলে বলব দাড়ি-গোঁফ অবশ্যম্ভাবী।

হারকিষণের আনা চায়ের কপি হাতে নিয়ে তিনজন ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। যে-রাস্তার উপরে বারান্দা, সেটাই পুব দিকে চলে গেছে সোজা দশাশ্বমেধ ঘাটে। রাস্তার দুদিকে সারি সারি দোকানে হিন্দি আর ইংবিজিতে লেখা সাইনবোর্ড। ফেলুদা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, তোপসে, তোকে যদি বলা যায় কলকাতার পাট উঠিয়ে এখানে এসে ধাবিক জীবনটা কাটাতে হবে-পারবি?

একটু ভেবে বললাম, বোধহয় না।

কিন্তু এখানে এসেছিস মনে করেই মনটা নেচে উঠছে–তাই নয় কি?

সত্যিই তাই। কাশীতে সারাজীবন থাকতে ভাল লাগবে না নিশ্চয়ই, কিন্তু যখনই ভাবছি আট-দশ দিনের বেশি থাকবার দরকার নেই তখনই মন বলছে বেনারসের মতো জায়গা হয় না।

তার কারণটা কী জানিস?-ফেলুদা বলল-তুই যে নীচের দিকে তাকিয়ে শুধু একটা রাস্তা দেখছিস তা তো নয়; তুই দেখছিস বেনারসের রাস্তা। বেনারস : কাশী! বারাণসী!-চারটিখানি কথা নয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর, পুণ্যতীর্থ পীঠস্থান : রামায়ণ মহাভারত মুনিঋষি যোগী সাধক হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন সব মিলে এই বেনারসের একটা ভেলকি আছে যার ফলে শহরটা নোংরা হয়েও ঐতিহ্যে ঝলমল করতে থাকে। যারা এখানে বসবাস করে তারা দিন গুজরানোর চিন্তায় আর এ সব কথা ভাববার সময় পায় না, কিন্তু যারা কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে আসে তারা এইসব ভেবেই মশগুল হয়ে থাকে।

লালমোহনবাবু এই ফাঁকে কখন জানি ভিতরে চলে গিয়েছিলেন, হঠাৎ তাঁর গলার আওয়াজ পেয়ে পিছন ফিরে দেখি তিনি সঙ্গে একজন অচেনা লোককে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। বছর পঞ্চাশেক বয়স, মাঝারি রং, মাথার কাঁচাপাকা চুল মাঝখানে সিঁথি করে পিছন দিকে টান করে আচড়ানো। চোখা নাকের নীচে পাতলা পান-খাওয়া ঠোঁট অল্প হাসিতে ফাঁক হয়ে আছে। ভদ্রলোক ফেলুদাকে নমস্কার করে বললেন, আপনার পরিচয় পেলুম এনার কাছ থেকে। আমার হাটেলের সম্মান বাড়ল, হেঃ হেঃ।

বুঝলাম ইনিই হলেন ম্যানেজার নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

কোনও অসুবিধা-টসুবিধা- ?

না না।-দিব্যি ব্যবস্থা।

আসুন, নীচে আসুন আমার ঘরে। আপনাদের চা দিয়েছে? শুধু চা? অ্যাঃ-ছিছি।

দেয়ালে তিনটে ইংরিজি আর দুটো বাংলা ক্যালেন্ডার, আর রবীন্দ্রনাথ সুভাষ বোস বিবেকানন্দ আর শ্রীঅরবিন্দর ছবি টাঙানো। ম্যানেজারের ঘরে বসে আমরা আরেক কাপ চা আর হালুয়া সোহন খেলাম। এ ঘরটা বাড়ির ভিতরের দিকে, তাই সাইকেল রিকশার হর্ন ছাড়া রাস্তার আর কোনও শব্দই আসে না।

নিরঞ্জনবাবু বললেন, আমার হোটেলে গত মার্চ মাসে বিশ্বশ্রী গুণময় বাগচী থেকে গেচেন-ওই আপনাদের তিন নম্বর ঘরটাতেই। ওঃ–কী মাস্‌ল মশাই! আদ্দির পাঞ্জাবি পরে গোধূলিয়ার মোড়ে পান। কিনতে গেচে, আর তিন মিনিটে রাস্তায় ভিড় জমে গেচে। হাত ভাঁজ করে পান মুখে পুরচে আর তাতেই বাইসেপ ঠেলে বেরুচ্ছে।..আপনি কিন্তু যাবার আগে আমাদের অ্যালবামে দু লাইন লিখে দিয়ে যাবেন। অনেক গুণী লোকের লেখা রয়েছে ওতে। তবে মাগ্যির বাজার, বোঝেন তো–মনের মতো মেনু দিতে পারব না। আপনাদের, এই যা দুঃখ।

ফেলুদা বলল, আপনি শুধু আমার লেখা চাইছেন কেন-ইনিও কিন্তু খ্যাক্তিতে কম যান না।

লালমোহনবাবু বিনয় করার ভাব করে কী একটা বলতে গিয়েও বললেন না। নিরঞ্জনবাবু হেসে বললেন, ওঁর কথা আমার ভায়রা ভাই আগেই জানিয়েচিল। আপনার আসাটা সারপ্রাইজ কিনা, তাই বলচি আর কী।

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উসখুস করছিলেন, এবার আর থাকতে না পেরে বললেন, কাগজে দেখলুম–এখানে একটি সাধুবাবার আবির্ভাব হয়েছে?

কে, আবলুস বাবা?

কই না তো। আবলুস তো নয়। মছলি-বাবা নাম দিয়েছে যে কাগজে।

ওই হল। হিন্দিওয়ালারা মছলি বলছে। আবলুস নাম আমার দেওয়া। গিয়ে দেখলে বুঝবেন নামকরণটা কেমন হয়েছে।

সত্যিই সাঁতরে এসেছেন নাকি?

প্রশ্নগুলো লালমোহনবাবুই করছেন, ফেলুদা শ্রোতা। নিরঞ্জনবাবু বললেন, তাই তো বলচে। বলে, এখন নাকি প্রয়াগ থেকে আসচেন; তবে স্টার্টিং পয়েন্ট হল গিয়ে হরিদ্বার। এখেন থেকে যাবেন মুঙ্গেরু-পাটনা। তারপর এক'দিন হয়তো দেখবেন বাবুঘাটে গিয়ে নোঙর ফেলেচেন বাবাজী?

অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাপারটা কী মশাই?

যা শুনিচি তাই বলচি। কেদার ঘাটে চিতপাত হয়ে পড়ে ছিলেন বাবাজী। ভোর রাত্তিরে অভয় চক্কোত্তি ঘাটে নেমেছেন। পয়ত্রিশ বছরের অভ্যোস মশাই—ঘড়ি ধরে সাড়ে চারটে—ফাস্ট টু অ্যারাইভ—শীত গ্রীষ্ম বিষর্ণ কোনও তফাত নেই। সত্তর বছর বয়স, চোখে ছানি। পা ফেলতে গিয়ে শানের বদলে নরম নরম কী ঠেকেছে, ঝুকে দেখেন মানুষ। গায়ের চামড়া কুঁচকানো, মনে হয় অনেকক্ষণ জলে ছিল। লোকটা এপাশ ওপাশ করছিল—যেন বেহুঁশ অবস্থা থেকে সবে জ্ঞান ফিরচে। চক্কোত্তি মশাই ঘাড় নিচু করে দেখাচেন, এমন সময় বাবাজী চোখ খুলে তাঁর দিকে চেয়ে হিন্দি টানে বাংলা ভাষায় বললেন, মা এত জল দিয়ে ঘিরে রেখেছে তোকে, তাও তার আগুনের ভয়?—ব্যস, ওই এক কথাতেই অভয় চক্কোত্তি কাত।

আমরা তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি দেখে নিরঞ্জনবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

কাশী আসার আগে অভয় চক্কোত্তি থাকতেন। চুচড়োয়। সেইখেনে একবার কালীপুজোয় তাঁর বাড়িতে আগুন লাগে। তাতে তাঁর স্ত্রী আর একটি চোদ্দো বছরের ছেলে মারা যায়। সেই থেকে ভদ্রলোক বিবাগী হয়ে কাশীবাসী হয়ে যান। অত্যন্ত সদাশয়, সাত্ত্বিক মানুষ। বাবাজীর এই কথায় তার মনের কী অবস্থা হবে সে তো বুঝতেই পারচেন।

সেদিন থেকেই বাবাজী অভয় চক্কোত্তির বাড়িতে?

সেদিন কী মশাই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দীক্ষা-টীক্ষা কমপ্লিট। তারপর যা হয়। খবর রটে যায়। লোক আসতে শুরু করে। রেগুলার দর্শন। ঘাটের কাছেই অভয় চক্কোত্তির বাড়ি। ভেতরে উঠন। দাওয়ার উপর বাবাজী বসেন, উঠনে ভক্তরা। একটি একটি ভক্ত কাছে যায়, বাবাজী তাদের একটি করে মন্ত্রপূত শঙ্ক দিয়ে দেন।

শঙ্ক কী মশাই? প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

মাছের আঁশ মশাই, মাছের আশ। লোকেরা বলছে স্বয়ং বিষ্ণু আবার মাছ হয়ে এসেছেন।

সে আঁশ কি খেতে হয় নাকি মশাই? লালমোহনবাবু এমনভাবে নাক কুঁচকেছেন যেন আঁশটে গন্ধ পাচ্ছেন।

খেতে হবে কেন? পরদিন সূর্য ওঠার ঠিক আগে—যাকে বলে ব্রাহ্মমুহূর্ত—সেই সময়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেই হল।

ওটা করে কি কেউ কোনও ফল পাচ্ছে?

আর পাঁচজনের কথা তো বলতে পারি না-আমার একটা কলিক পেনের মতো হচ্ছিল; গোপেন ডাক্তার ম্যাগফস খেতে বলেচিল। খাচ্ছিলুম। বাবাজী এলেন, দর্শন করলুম, আঁশ পেলুম—পরদিন জলে ভাসিয়ে দিলুম। এখন পেনাটা নেই বললেই চলে—তা সে হোমিওপ্যাথির গুণ না আঁশপ্যাথির গুণ তা বলতে পারি না।

কদ্দিন থাকবেন এখানে কিছু জানেন?

ইনি ডাঙায় কোনওখানেই নাকি বেশিদিন থাকেন না। তবে এর যাওয়ার দিনটা নাকি ভক্তরাই ঠিক করে দেন।

কীরকম?

সেটা আজি সন্ধেবেলা জানা যাবে। আপনাদের নিয়ে যাব। আজই নাকি জানা যাবে বাবাজীর কাশীর মেয়াদ আর ক'দিন।

২. নিরঞ্জনবাবুর ঘরে বসে

নিরঞ্জনবাবুর ঘরে বসে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ভদ্রলোক বললেন, ওঁর হাতে কিছুটা সময় আছে, তারপর নাকি ব্যাঙ্কে যেতে হবে, তার আগে পর্যন্ত উনি আমাদের সঙ্গে ঘুরবেন।

হাটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে কিছু দূর গেলেই রাস্তার লোক আর গাড়ি চলাচলের শব্দের সঙ্গে একটা নতুন শব্দ কানে আসতে থাকে। আরও কিছু দূর গেলেই একটা মোড় ঘুরে সামনে গঙ্গা দেখতে পাওয়া যায়। এখান থেকে রাস্তাটা ঢালু হয়ে সিঁড়ির ধাপ আরম্ভ হয়ে যায়। প্রত্যেক ধাপের মাঝখানে আর দুপাশে লাইন করে ভিখিরি। এক সঙ্গে এত ভিখিরি এর আগে কখনও দেখিনি। এই ভিখিরির আশেপাশেই চরে বেড়াচ্ছে বোকা-পাঠার দল। লালমোহনবাবু বললেন, ধন্যি আপনার নাকের স্মরণশক্তি মশাই। এ গন্ধ তো আমি নিজেও পেয়েছি আগের বার-কিন্তু ভুলে গেলাম কী করে?

দশাশ্বমেধ ঘাটের বর্ণনা দিতে গেলে আমিও হয়তো লালমোহনবাবুর মতো জমজমাট কথাটা ব্যবহার করতাম, কিন্তু ফেলুদার ধমকের পর আর করব না। হোটেলে ফিরে এসে ঘাটের লোককে কী কী কাজ করতে দেখেছি তার একটা নম্বর দেওয়া লিস্ট করতে গিয়ে একশো তেরো অবধি পৌঁছে থেমে গেলাম। সেটা আবার ফেলুদা পড়ে বলল, দিব্যি হয়েছে।-কেবল গোটা ত্রিশোক বাদ পড়েছে।

ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে চাইলে রেলের ব্রিজটা দেখা যায়, আর পুব দিকে নদীর ওপারে দেখা যায় রামনগর-যেখানে রাজা আছে, কেল্লা আছে, আর নদীর ধারে নাকি সন্ন্যাসীদের একটা আস্তানা আছে।

দশাশ্বমেধের পাশেই উত্তরে হল মানমন্দির ঘাট। ঘাটের উপরেই একটা বাড়ির ছাতে প্রায় চারুশো বছর আগে রাজা জয়সিংহের তৈরি জ্যোতিবিদ্যার যন্ত্রপাতি রয়েছে। দিল্লিরটার মতোই এটাও একটা ছোটখাটা যন্তরী-মন্তর। ফেলুদা হয়তো সেটা দেখবার মতলবেই মানমন্দির ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল, এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল।

এটা বলা দরকার যে এদিকটায় দশাশ্বমেধের স্নানের হট্টগোল প্রায় পৌঁছেয়ে না বললেই চলে। আওয়াজের মধ্যে দূর থেকে ভেসে আসা লাউডস্পিকারে হিন্দি ফিল্মের গান, আর আমাদের থেকে বেশ কয়েক ধাপ নীচে দুজন লোকের কাপড় কাচার শব্দ। আমাদের ডান দিকে একটা বটগাছ, তাতে কতগুলো বাঁদর বাঁদরামো করছে। গাছের উপর দিকের ডালপালা একটা হলদে বাড়ির ছাতের উপর নুয়ে পড়েছে। একটা চিৎকার শুনে আমাদের চারজনেরই দৃষ্টি ছাতটার দিকে চলে গেছে।

একটি ছেলে ছাতের পাঁচিলের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। তিনতলা বাড়ির ছাত। ছেলেটি যেখানে দাঁড়িয়েছে তার সামনে একটা সরু গলি, আর গলির ওপাশে আরেকটা তিনতলা বাড়ি; সেটার রং লাল। সেটার ছাতেও নিশ্চয়ই একজন কেউ আছে, যদিও তাকে দেখা যাচ্ছে না। তাকেই উদ্দেশ করে প্রথম ছেলেটি চ্যাঁচাচ্ছে।

শয়তান সিং?

হাঁক দেবার মেজাজটা যেন সে একটা ফিল্মের হিরো।

পাশ থেকে নিরঞ্জনবাবু ফিসফিস করে বললেন, ঘোষালদের বাড়ির ছেলে। দুর্দান্ত ডানপিটে।

আমার তলপেটটা কেমন জানি করছে। ছেলেটি যদি একবার টাল হারায় তো চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট নীচে পাথরে বাঁধানো রাস্তায় পড়বে।

আর লুকিয়ে কোনও লাভ নেই। আমি জানি তুমি কোথায় আছ!—আবার চিৎকার করে উঠল। ছেলেটি।

ফেলুদাও টান হয়ে উপরের দিকে চেয়ে ঘটনাটা দেখছে। এবার লালমোহনবাবুর খসখসে চাপা গলা শোনা গেল।

শয়তান সিং হচ্ছে অক্রূর নদীর লেখা পাঁচখানা বইয়ের ভিলেন মশাই—রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ।

আমি আসছি তোমার কাছে।—আবার চিৎকার এল—তুমি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হও।

ছেলেটি হঠাৎ পাঁচিল থেকে নেমে উধাও। ভাবছি। এবার কী নাটক দেখব কে জানে, এমন সময় হঠাৎ দেখি একটা বাঁশ হলদে বাড়ির পাঁচিলের উপর দিয়ে বেরিয়ে সামনের লাল বাড়ির ছাতের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুই বাড়ির মাঝখানে একটা ব্রিজ তৈরি করল। এইবার ফেলুদা মুখ খুলল, যদিও গলার স্বর চাপা।

ওনার মতলবটো কী?

শয়তান সিং —আবার হুঙ্কার। তুমি দশ গুনতে গুনতে আমি তোমার কাছে এসে পড়ব।

এবার যেটা ঘটল তাতে আমাদের সকলেরই ঘাম ছুটে গেল।

ছেলেটি পাঁচিল থেকে কার্নিশে নেমে খপ করে বাঁশটা ধরে শূন্যে ঝুলে পড়ল।

এক...দুই...তিন...চার...

উলটা দিকের ছাত থেকে শয়তান সিং গুনতে শুরু করেছে, আর এ ছেলেটি বাঁশ ধরে ঝুলতে ঝুলতে এগোচ্ছে।

একটা কিছু করুন মশাই। নিরঞ্জনবাবু ধরা গলায় বললেন,—আমার কলিক পেনটা আবার–

ফেলুদার ডান হাতের তর্জনীটা গোখরোর ফোঁস করার মতো এক লাফে ঠোঁটে চলে এল। আমরা সবাই দম বন্ধ করে এই খুদে ছেলের দুঃসাহসিক ব্যাপারটা দেখতে লাগলাম।

ছয়...সাত...আট...ন—য়!

নয় গোনার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি উলটো দিকে পৌঁছে গিয়ে কার্নিশে পা ফেলেই বাঁশেরই উপর ভর করে পাঁচিল টপকে লাল বাড়ির ছাতে নেমে গেল। তারপর শোনা গেল একটা অচেনা গলায় এক বিকট চিৎকার, আর সেই সঙ্গে প্রথম ছেলেটির এক অদ্ভুত হাসি।

।লালমোহনবাবু বললেন, মেরেই ফেললে নাকি মশাই?—কোমরে যেন ছারা গোছের কী একটা বুলিতে দেখলুম।

ফেলুদা গলির দিকে পা বাড়িয়ে বলল, ভিলেনটি কীরকম জানি না, হিরোটি যে দুর্দান্ত সাহসী তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

নিরঞ্জনবাবু বললেন, ঘোষাল বাড়িতে রিপোর্ট করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই।

আমরা আরেকটু এগোতেই লাল বাড়িটার দরজার সামনে পৌঁছে গেলাম। ভিতরে অন্ধকার। কাছেই বোধহয় সিঁড়ি, কারণ ধুপ ধাপ পায়ের শব্দ পাচ্ছি, আর সেই সঙ্গে ছেলেটির কথা এগিয়ে আসছে।

...তারপর ঝপাৎ করে পড়বে জলে, আর ভাসতে ভাসতে ভাসতে ভাসতে চলে যাবে একেবারে সমুদ্রে, আর সেখানে একটা হাঙর এসে টপ করে গিলে ফেলবে। আর সেই

হাঙরটা যখন ক্যাপ্টেন স্পার্কের দিকে চার্জ করবে, তখন ক্যাপ্টেন স্পার্ক হারপুন দিয়ে ঘ্যাচাং করে মারবে সেটার পেটে, আর–

এইটুকু বলে আর বলা হল না, কারণ ঘামে চপ চপা ছেলে দুটি দরজা দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে, আর প্রথম ছেলেটি আমাদের দেখেই থমকে দাঁড়িয়েছে। বয়স বছর দশের বেশি। নয়, ধপধাপে। ফরসা রং, চোখ নাক একেবারে রাজপুত্তরের মতো। অন্য ছেলেটির বয়স কিছুটা বেশি। ইনি যে বাঙালি নন। সেটা দেখলেই বোঝা যায়। দুজনেরই চোয়াল যেভাবে চলছে তাতে বোঝাই যায় তারা মুখে চুইং গাম পুরে নিয়েছে।

ফেলুদা প্রথম ছেলেটিকে বলল, ও-তো শয়তান সিং আর তুমি কে?

ক্যাপ্টেন স্পার্ক, চাবুকের মতো উত্তর দিল ছেলেটি।

তোমার আরেকটা নাম আছে না? তোমার বাবা তোমাকে কী বলে ডাকেন?

আমার নাম ক্যাপ্টেন স্পার্ক। আমার বাবাকে বিষাক্ত তীর মেরে খুন করেছিল শয়তান সিং আফ্রিকার জঙ্গলে। তখন আমার বয়স সাত। তখন থেকে আমার চোখে প্রতিহিংসার বিদ্যুৎ জ্বলে, তাই আমার নাম স্পার্ক।

সর্বনাশ, বললেন লালমোহনবাবু, এ যে অক্রুর নদীর বই মুখস্থ করে ফেলেছে মশাই!

ছেলেটি লালমোহনবাবুর দিকে একবার কাঁটমট করে তাকিয়ে তার বন্ধুকে নিয়ে গভীরভাবে গলি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বর্ন অ্যাকটর–মন্তব্য করলেন জটায়ু।

ফেলুদা নিরঞ্জনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, ঘোষাল বাড়িতে কাউকে চেনেন?

চিনব না? অ্যাদ্দিন রয়েছি কাশীতে। ওদের সকলেই চেনে। প্রায় একশো বছর হল বেনারসে বাস। এই যে খোকাকে দেখলেন, এর ঠাকুরদা অম্বিকা ঘোষাল এখানেই

থাকেন। ওকালতি করতেন, বছর খানেক হল ছেড়ে দিয়েছেন। খোকার বাপ উমানাথ ঘোষাল কলকাতায় থাকেন, কেমিক্যালের ব্যবসা। প্রত্যেক পুজোয় ফ্যামিলি নিয়ে এখেনে আসেন। এদের বাড়িতেই দুর্গাপুজো হয়। খানদানি পরিবার মশাই। এদের জমিদারি ছিল। ইস্টবেঙ্গলে পদ্মার ধারে।

একবার উমানাথের সঙ্গে দেখা করা যায়?

কেন যাবে না। আপনারা তো আবলুসবাবা দর্শনে যাবেন বলছিলেন, সেখানেও দেখা হয়ে যেতে পারে। শুনাচি নাকি ইনিও দীক্ষা নেবেন নেবেন করচেন।

আবলুসবাবাকে দেখে নিরঞ্জনবাবুর নামকরণের তারিফ না করে পারা যায় না। ফেলুদা দেখেছে কি না জানি না, আমি নিজে জীবনে এত মিশকালো লোক দেখিনি। শুধু কালো নয়, এমন মসৃণ কালো যে হঠাৎ দেখলে মনে হয়, গায়ে বুঝি সাপের খোলসের মতো একটা কিছু পরে আছেন। তার উপরে কাঁধ অবধি ঢেউ খেলানো চুল, আর বুক অবধি ঢেউ খেলানো দাড়ি-দুটোই কুচকুচে কালো। সাধুবাবা জোয়ান লোক; বয়স ত্রিশ-পয়ত্রিশের বেশি হলে আশ্চর্য হর। অবিশ্যি জোয়ান না হলে আর এত সাঁতার কাটেন কী করে। বাবার চেহারা আরও খোলতাই হয়েছে তার গায়ের টকটকে লাল সিল্কের চাদর আর লুঙ্গির জন্য।

আমরা চারজন উঠনে ভক্তদের ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়েছি, বাবাজী বারান্দায় শীতল-পাটির উপর বিছানো একটা সাদা চাদরে বসেছেন, তার দু পাশে দুটো আর পিছনে একটা হলদে। মখমলের তাকিয়া। বাবার বাঁ পাশে একজন বৃদ্ধ চোখ বুজে হাত জোড় করে বসে আছেন, বোঝাই যাচ্ছে ইনি হলেন অভয় চক্রবর্তী। বাবা নিজে পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসে। অল্প অল্প দুলছেন, আর ডান হাতের তোলো দিয়ে হাঁটুতে হাত বুলোচ্ছেন। দোলানিটা হচ্ছে তালে তালে, কারণ বারান্দার এক ধারে বসে একজন লোক কাঠের খঞ্জনি বাজিয়ে একটা হিন্দুস্থানি

ভজন গাইছে। গানের প্রথম দুটো লাইন মনে ছিল, হোটেলে ফিরে এসে খাতায় লিখে রেখেছিলাম—-

ইতিনী বিনতি রঘুনন্দন সে
দুখ দ্বন্দ্ব হামারা মিটাও জী–

আজ আর সেই মাছের আঁশের ব্যাপারটা হচ্ছে না। তার বদলে আজ একটা বিশেষ ঘটনা ঘটবার কথা আছে; মছলিবাবা আজ তার ভক্তদের কাছ থেকে জেনে নেবেন আর ক'দিন পরে তাঁকে কাশী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সেটা যে কী ভাবে জানা হবে তা এখনও কেউ জানে না।

লালমোহনবাবুর দেখছি বেনারসে এসেই ভক্তিভাবটা একটু বেড়ে গেছে। সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে ওঁকে বার তিনেক বেশ গলা উচিয়ে জয় বাবা বিশ্বনাথ বলতে শুনেছি। এখানে এসে দেখছি বাবাজীকে দেখেই ওঁর হাত দুটো আপনা থেকেই জোড় হয়ে গেছে। এত ভক্তি দেখালে অ্যাডভেঞ্চার গল্পের প্লট মাথায় কী করে আসবে জানি না! বোধহয় ভাবছেন মছলিবাবা ওঁকে স্বপ্নে প্লট দিয়ে দেবেন।

কালো প্যান্ট আর নীল রঙের গুরু, শার্ট পরা একজন ভদ্রলোক সবেমাত্র আমাদের পিছন দিয়ে ঢুকে আমাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে বোধহয় ভাবছেন ভিড় ঠেলে কী করে এগোনো যায়। নিরঞ্জনবাবু লোকটির দিকে ঝুকে পড়ে বললেন, ঘোষাল সাহেব এলেন না? ভদ্রলোক গলা নামিয়ে উত্তর দিলেন, আজ্ঞে না, ওনার খুড়তুতো ভাই আর তার স্ত্রী এসে পৌঁছেছেন। আজ দুর্গপুর থেকে, বাড়িতে তাই...

ভদ্রলোকের রং ফরসার দিকে, জুলপিটা হাল ফ্যাশানের, চোখে চশমা, সব মিলিয়ে মোটামুটি চালাক চতুর চেহারা।আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।-নিরঞ্জনবাবু ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন-ইনি বিকাশ সিংহ-উমানাথবাবুর সেক্রেটারি।

তারপর আমাদের তিনজনেরও পরিচয় করিয়ে দিলেন নিরঞ্জনবাবু। ফেলুদার নাম শুনেই সিংহি মশাইয়ের ভুরুটা কুঁচকে গেল।

প্রদোষ মিত্র? গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র?

হ্যাঁ মশাই,-নিরঞ্জনবাবু গলা চাপতে ভুলে গেলেন—স্বনামধন্য ডিটেকটিভ। আর ইনিও অবিশ্যি কম ইয়ে নন-

নিরঞ্জনবাবু লালমোহনবাবুর দিকে দেখানো সত্ত্বেও সিংহ মশাইয়ের দৃষ্টি ফেলুদার দিকেই রয়ে গেল। ভদ্রলোক কী যেন বলতে চাইছেন।

ইয়ে আপনি এখানে আছেন জানলে...কোথায় উঠেছেন বলুন তো?

আমারই হোটেলে মশাই।-নিরঞ্জনবাবু এবার খেয়াল করে গলাটা নামিয়ে কথাটা বুললেন।

ঠিক আছে, মানে... বিকাশবাবু এখনও আমতা-আমতা করছেন-একবারটি বোধহয়. ঠিক আছে, কাল না হয় যোগাযোগ করব।

ভদ্রলোক নমস্কার করে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন।

এক ব্ৰহ্ম, এক সূর্য, এক চন্দ্র।

মছলিবাবা দুহাত তুলে চেঁচিয়ে উঠছেন। ভজন থেমে গেল। ভক্তরা সবাই থমকে গিয়ে সোজা হয়ে বসল। এতক্ষণ লক্ষ করিনি, এবার দেখলাম। বাবার যেদিকে অভয়বাবু বসেছেন। তার উলটোদিকে আরেকটি ভদ্রলোক—বছর চল্লিশোক বয়স-সামনে একটা নকশা করা থলি নিয়ে বসেছেন। থলির পাশে স্তুপ করে কালো কালো কী জানি রাখা রয়েছে।

দু হাত দু পা দু চোখ দুকান!– বাবাজী আবার শুরু করলেন। এ সব বলার কী মানে কিছুই বুঝতে পারছি না; অন্যেরা কেউ বুঝছে কি না তাও বুঝতে পারছি না।

তিন কুল তিনি কাল চার দিক চার যুগ পঞ্চ ভূত পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ নন্দ পঞ্চ পাণ্ডব-এক, দো, তিন, চার, পাঁচ!

বাবাজী একটু থামলেন। থলিওয়ালা ভদ্রলোক তার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন, ভক্তরাও সব চেয়ে আছে। লালমোহনবাবু আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, থ্রিলিং। বাবাজী আবার শুরু করলেন–

ছে রিপু ছে ঋতু, সপ্ত সুর সপ্ত সিন্ধু, অষ্ট ধাতু অষ্ট সিদ্ধি, নবরত্ন নবগ্রহ, দশকর্ম দশ মহাবিদ্যা দশাবতার দশাশ্বমেধ-এক থেকে দশ।

এইটুকু বলে বাবাজী থলিওয়ালা ভদ্রলোকের দিকে ইশারা করলেন। ভদ্রলোক ফিসফিস করে বাবাজীকে কী যেন বলে দিলেন। তারপর ভক্তদের দিকে ফিরে অস্বাভাবিক রকম সরু গলায় বললেন, এবার আপনারা এক থেকে দশের মধ্যে একটি সংখ্যা বেছে নিয়ে একে একে বাবাজীর সামনে এসে এই থলির মধ্যে থেকে একটি কাগজের টুকরো নিয়ে তাতে এই কাঠকয়লার সাহায্যে সংখ্যাটি লিখে আমার হাতে দিয়ে দেবেন। প্রথমে বাংলায় বলে আবার সেটা হিন্দি করে বললেন।

ফেলুদা নিরঞ্জনবাবুর দিকে ঝুকে পড়ে বলল, যে সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি বার পড়বে, সেটাই কি বলে দেবে বাবা ক'দিন থাকবেন?

হয়তো তাই। সেটা তো বললে না কিছু!

যদি তাই হয় তা হলে বোধহয় বাবাজীর সাতদিনের বেশি মেয়াদ নেই।

আপনি লিখবেন নাকি?

না মশাই। বাবা থাকছেন কি যাচ্ছেন সে নিয়ে তো আমাদের অন্ত মাথাব্যথা নেই। আমরা দেখতে এসেছি, দূর থেকে দেখে চলে যাব-ব্যস। তবে একটা জিনিস জানার কৌতূহল হচ্ছে। এইসব ভক্তদের মধ্যে কিছু কিছু গণ্যমান্য লোকও আছেন তো, নাকি সবাই সাজানো ভক্ত?

কী বলছেন মশাই।–নিরঞ্জনবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল।এরা সব বলতে পারেন। একেবারে ক্রিম অফ কাশী। ওই দেখুন–সাদা চাদর গায়ে, মাথায় টাক-উনি হলেন শ্রুতিধর মহেশ বাচস্পতি, মহাপণ্ডিত–আজন্ম কাশীতে রয়েছেন। তারপর ওই দেখুন মৃত্যুঞ্জয় সেন কবিরাজ, দয়াশঙ্কর শুক্লা–এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের এজেন্ট। যিনি বাবাজীর পাশে থালি নিয়ে বসে আছেন তিনি হলেন অভয় চক্কোত্তির ভাইপো-আলিগড় ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজির প্রোফেসার। উকিল ব্যারিস্টার ডাক্তার প্রোফেসর হালুইকর–কিছু বাদ নেই মশাই। আর মহিলা কত আছেন সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। আর ওই দেখুন–

নিরঞ্জনবাবু একজন সাদা পাঞ্জাবি আর সাদা বেনারসি টুপি পরা জাঁদরেল লোকের দিকে দেখলেন।

ওকে চেনেন? উনি হলেন মগনলাল মেঘরাজ। ওঁর মতো পয়সা আর দাপট কাশীতে আমার কারুর নেই। বেনারসে যদি বাঘ থাকত তো এখানকার বলদগুলোর সঙ্গে এক ঘাটে জল খেতি ওঁর নামে।

মগনলাল মেঘরাজ?...নামটা চেনাচেন মনে হচ্ছে।

নিরঞ্জনবাবু ফেলুদার দিকে আরও খানিকটা ঝুকে পড়লেন–আর সেই সঙ্গে আমিও।

দুবার পুলিশ রেড হয়ে গেছে। ওর বাড়িতে। একবার কলকাতায়-ওর বড়বাজারের গদিতে–একবার এখেনে। চোরা কারবার, কালো টাকা-যা ভাবতে চান ভাবুন না।

পুলিশ তো পায়নি কিছু–তাই না?

পুলিশ তো সব ওর হাতের মুঠোয় মশাই। রেড তো নামকাওয়াস্তে।

ভক্তের দল এখনও একজন একজন করে গিয়ে কাগজে নম্বর দিয়ে আসছে। দেখে মনে হয় বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে। আমরা আরও মিনিট পাঁচেক দেখে বাইরে বেরিয়ে এলাম। গেটের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে পিছন থেকে একটা ডাক শুনে ঘুরে দেখি যার সঙ্গে নিরঞ্জনবাবু আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন, সেই মিস্টার সিংহ ব্যস্তভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

আপনারা চললেন?-ভদ্রলোক বিশেষ করে ফেলুদার দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করলেন। উত্তরে ফেলুদা কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বললেন, ইয়ে, আপনাদের এখনই একবারটি আমাদের বাড়ি আসা সম্ভব হবে কি? মিস্টার ঘোষাল আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে খুশি হতেন।

ফেলুদা হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, আমাদের আর কী অসুবিধা বলুন। নিরঞ্জনবাবুকে অবিশিষ্ট হয়তো হোটেলে ফিরে যেতে হবে।

আপনারা তিনজনে ঘুরে আসুন, নিরঞ্জনবাবু বললেন, তবে বেশি রাত না করলে খাবারটা গরম গরম খেতে পারবেন—এইটে শুধু বলে রাখলাম। আজ। আপনাদের জন্য ফাউল কারি করতে বলিচি।

৩. ভুবনেশ্বরের যক্ষীর ভাঙা মাথা

আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনিই তো ভুবনেশ্বরের যক্ষীর ভাঙা মাথা উদ্ধার করে দিয়েছিলেন।–তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ–ফেলুদা ওর পক্ষে যতটা সম্ভব বিনয়ী হাসি হেসে বলল। উমানাথ ঘোষালের বয়স চল্লিশের বেশি না, গায়ের রং ছেলেরই মতো টকটকে, চোখ দুটো কটা আর ঢুলু

ঢুলু। কথা বলার সময় লক্ষ করলাম যে দুটো ভুরু এক সঙ্গে কখনই উপরে উঠছে না; একটা ওঠে তো অন্যটা নীচে থেকে যায়।

এঁরা সব আপনার–?-ভদ্রলোকের দৃষ্টি ফেলুদার দিক থেকে আমাদের দুজনের দিকে ঘুরে গেছে।

এটি আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ, আর ইনি লালমোহন গাঙ্গুলী, জটায়ু ছদ্মনামে অ্যাড়তেঞ্চারের গল্প লেখেন।

জটায়ু?-উমানাথের ডান ভুরুটা উঠে গেল।নামটা চেনা চেনা লাগছে। রুকুর কাছে ওঁর কিছু বই দেখেছি বলে যেন মনে পড়ছে। তাই না হে বিকাশ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বললেন বিকাশবাবু, খান তিনেক আছে বোধহয়।

বোধহয় আবার কী। তুমিই তো যত রাজ্যের রহস্যের বই কিনে দাও ওকে।

বিকাশবাবু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন, ও ছাড়া ও আর কিছু পড়তেই চায় না।

এ বয়সে তো ও সব পড়বেই, পড়বেই, বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। সকালে ক্যাপ্টেন স্পার্ক আর শয়তান সিং-এর নাম শোনা অবধি উনি বেশ মনমরা হয়ে ছিলেন; এখন আবার মুখে হাসি ফুটেছে। রহস্য রোমাঞ্চ বইয়ের বাজারে অক্রুর নদী নাকি জটায়ুর সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী।

ফেলুদা বলল, আমি এমনিতেই একটা কারণে আপনার কাছে আসতে চেয়েছিলাম।..আপনার ছেলের সঙ্গে আজ আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। তার আসল নামটা যদিও এখনও জানতে পারিনি, তবে সে যে ভূমিকায় অভিনয় করছিল তার নামটা জানি।

অভিনয়?–উমানাথবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন। আরে ও যে শুধু নিজে অভিনয় করে তা তো নয়, অন্যদেরও যে নামটাম বদলে অভিনয় করায়। তোমাকেও একটা কী নাম দিয়েছিল না, বিকাশ?

মাত্র একটা? বিকাশবাবুও হেসে উঠলেন।

যাই হাক–তা, কোথায় দেখা হল আমার ছেলের সঙ্গে?

ফেলুদা কোনওরকম ঝাড়াবাড়ি না করে অল্প কথায় অত্যন্ত গুছিয়ে সকালের ঘটনাটা উমানাথবাবুকে বলল। ভদ্রলোক শুনে প্রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

কী সর্ব্বনাশের কথা!!–ছেলে আমার ডানপিটে সে তো জানি; তা বলে তার এতটা দুঃসাহস সে তো জানতাম না; ও তো মরতে মরতে বেঁচে গেছে! রুকুকে একবার ডেকে পাঠাও তো হে বিকাশ।

মিস্টার সিংহ ছেলেটির খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। ফেলুদা বলল, ডাকনাম রুকু সে তো জানলাম। ভাল নামটা কী?

রুক্মিণীকুমার, বললেন উমানাথবাবু।ও-ই আমার একমাত্র ছেলে; কাজেই ঘটনাটা শুনে আমার মনের অবস্থা কী হচ্ছে সে তো বুঝতেই পেরেছেন।

দুর্গাকুণ্ড রোডের উপর বিরাট কম্পাউন্ডের মধ্যে বিশাল বাড়ি ঘোষালদের। রাত্রে বাড়ির বাইরেটা ভাল করে দেখতে পাইনি—শুধু গেটের উপর মার্বেল ফলকে লেখা শংকরী-নিবাস নামটা দেখেছি। আমরা বসেছি। একতলার বৈঠকখানায়। আমাদের ডান পাশে দরজা দিয়ে পুজোর দালান দেখা যাচ্ছে। আমি যেখানে বসেছি সেখান থেকে প্রতিমার আধখানা দেখতে পাচ্ছি। রং করার কাজ এখনও চলেছে।

চাকর ট্রেতে করে চা-মিষ্টি এনে আমাদের সামনে টেবিলে রেখে যাবার পর উমানাথবাবু বললেন, আপনারা মছলিবাবা দর্শনে গিয়েছিলেন শুনলাম। কী মনে হল দেখেটেখে?

ফেলুদা একটা পেড়ার আধখানা কামড় দিয়ে মুখে ফেলে বলল, আমরা অল্পক্ষণই ছিলাম; শুনলাম। আপনিও নাকি যাচ্ছেন?

যাচ্ছি মানে একবারই গেছি। দ্বিতীয়বার যাবার আর বাসনা নেই, কারণ সেদিন আমি না-থাকার জন্যেই দুর্ঘটনা ঘটল।

উমানাথবাবু চুপ করলেন। আমরাও চুপ। লালমোহনবাবু দেখলাম আড়চোখে একবার ফেলুদার দিকে দেখে নিলেন।

দুর্ঘটনা?–ফেলুদা ফাঁক ভরাবার জন্য প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ। উমানাথবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। শুধু দামের দিক দিয়ে নয়, প্রভাবের দিক দিয়েও একটি অমূল্য জিনিস। গত বুধবার-অর্থাৎ আমি যেদিন বাবাজীকে দেখতে যাই সেদিন।–আমার বাবার ঘর থেকে উধাও হয়ে গেছে। আপনি যদি সেটিকে উদ্ধার করতে পারেন তো আমাদের অশেষ উপকার হবে, এবং সেই সঙ্গে আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দেব।

আমার বুকের ভিতরে আমার খুব চেনা একটা ধুকপুকুনি আরম্ভ হয়ে গেছে।

জিনিসটা কী সেটা জানতে পারি? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ছোট্ট একটা জিনিস, মিস্টার ঘোষাল দু আঙুল ফাঁক করে জিনিসটার সাইজ বুঝিয়ে দিলেন। আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটা গণেশের মূর্তি। সোনার মূর্তি, তার উপর দামি পাথর বসানো।

ওটা কীভাবে এল আপনাদের বাড়িতে?

বলছি সেটা। একেবারে গল্পের মতো।..আপনার তো বোধহয় চারমিনার ছাড়া চলে না–

ভদ্রলোক নিজে একটা ডানাহিল মুখে পুরুতেই ফেলুদা আগুন এগিয়ে দিয়ে সেই সঙ্গে নিজেও একটা চারমিনার ধরিয়ে নিল। একটা বড় টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মিঃ ঘোষাল তাঁর কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

আমার ঠাকুরদাদার বাবা সোমেশ্বর ঘোষালের ছিল ভ্রমণের নেশা। ছব্বিশ বছর বয়সে তিনি একা দেশ দেখতে বেরিয়ে যান। তখন নতুন রেলগাড়ি হয়েছে, কিছু পথ তাতে যাবেন, আর বাকিটা হয় হেঁটে, আর না হয়তো যা যানবাহন পাওয়া যায়। তাতেই। দক্ষিণ ভারতে ঘুরছিলেন। ত্রিচিনপল্লী থেকে মাদুরা হয়ে সেতুবন্ধের দিকে যাচ্ছিলেন গোরুর গাড়িতে, জঙ্গলে ভরা পাহাড়ে পথ দিয়ে। এই সময় মাঝরাত্তিরে তিনটি সশস্ত্র ডাকগত তাঁর গাড়ি আক্রমণ করে। সোমেশ্বর সাংঘাতিক শক্তিশালী লোক ছিলেন। সঙ্গে বাঁশের লাঠি ছিল। এক তিনজনের সঙ্গে লড়ে একটির মাথা ফাটিয়ে দেন, অন্য দুটি পালায়। ডাকাতদের একটা থলে পিছনে পড়ে থাকে। তার মধ্যে ছিল এই গণপতি। সেই মূর্তি সঙ্গে করে উনি দেশে ফেরেন। তারপর থেকেই আমাদের বংশের ভাগ্য ফিরে যায়। আমাকে। আপনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেকেলে মানুষ বলে মনে করবেন না। আমাদের বংশে যা ঘটতে দেখেছি তার থেকে কতকগুলো বিশ্বাস আমার মনে জন্মেছে,–ব্যস, এইটুকুই। সত্যি বলতে কী, গণেশ আসার পর থেকে আমাদের ফ্যামিলিতে কোনও বড় রকম দুর্ঘটনা ঘটেনি বললেই চলে। ওটা আসার দু বছরের মধ্যেই পদ্মার ভাঙনে নদী আমাদের বাড়ির বিশ হাতের মধ্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু বাড়ির কোনও ক্ষতি হয়নি। অবিশ্যি এ ছাড়াও আরও অনেক নজির আছে, সব দিতে গেলে দীর্ঘ ইতিহাস হয়ে যাবে। আসল কথা এই যে, একশো বছর আমাদের ফ্যামিলিতে থাকার পর আজ সে মূর্তি উধাও। বাড়িতে পুজো, বাইরে থেকে আত্মীয়স্বজন আসছে, কিন্তু সমস্ত সমারোহের উপর যেন একটা ছাড়া পড়ে রয়েছে।

উমানাথবাবু যেন ক্লান্ত হয়ে সোফায় এলিয়ে পড়লেন। ফেলুদা প্রশ্ন করল, কবে গিয়েছিলেন। আপনি মছলিবাবাকে দেখতে?

তিনদিন আগে। গত বুধবার। পনেরোই অক্টোবর। আমরা এসেইছি মাত্র দিন দশেক হল। মছলিবাবার কথা শুনে আমার গিন্নির দেখতে যাবার শখ হল, তাই ওঁকে আর রুকুকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম।

আপনার ছেলেও যেতে চাইল?

নামটা শুনে কৌতুহল। বলল ওর কোন এক বইয়েতে নাকি কার কথ্য রয়েছে যে সত্তর মাইল সাঁতার কেটে এসেছিল কুমির হাঙরের মধ্যে দিয়ে। অবিশ্যি বাবাজীকে দেখে মোটেই ভাল লাগেনি। দশ মিনিটের মধ্যে উসখুসি শুরু হয়ে গেল। ওর জন্যেই তো তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। এসে দেখি এই কাণ্ড।

সিন্দুক আপনার বাবার ঘরে থাকে বলছিলেন না?

হ্যাঁ, তবে চাবিটা এমনিতে আমার ঘরেই থাকে। রিং-এর মধ্যে পাঁচ ছটা চাবি, তার মধ্যে একটিই হল ওই সিন্দুকের। এমনিতে কোথাও বেরোলে আমার স্ত্রীর কাছে চাবিটা থাকে, কিন্তু সেদিন ও-ও যাচ্ছে বলে বাবার ঘরের দেরাজে চাবিটা রেখে যাই। হয়তো খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি, কারণ বাবা সন্ধের দিকে একটু আফিম-টাফিম খান, খুব একটা কুঁশ থাকে না। যাই হাক—যাবার সময় চাবিটা রেখে দেরাজটা একেবারে শেষ অবধি ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আধা ইঞ্চি খোলা। সন্দেহ হয়; তখন সিন্দুক খুলে দেখি গণেশ নেই।

ফেলুদা একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে বলল, আপনাদের বাড়িতে সেদিন সেই সময়ে কে কে ছিলেন সেটা জানতে পারি কি?

ফেলুদা খাতা আনেনি, তবে উত্তরটা যে ওর মুখস্থ থাকবে, আর নামগুলো হোটেলে গিয়ে লিখে নিতে পারবে সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

মিঃ ঘোষাল বললেন, দারোয়ান ত্রিলোচনকে আপনারা গেটে দেখলেন; ও প্রায় পয়ত্রিশ বছর হল আমাদের বাড়িতে রয়েছে। চাকর ঠাকুর ঝি সবাই পুরনো। প্রতিমা গড়েন শশীবাবু আর তার ছেলে কানাই। শশীবাবু কাজ করছেন ত্রিশ বছরের উপর। ছেলেটিও খুব ভাল। এ ছাড়া মালী আছে, সে পুরনো। আর আছে বিকাশ-যে আপনাদের সঙ্গে কএ নিয়ে এল।

বিকাশবাবু কদ্দিন আছেন?

সেক্রেটারির কাজ করছে বছর পাঁচেক, আছে অনেকদিন। ও প্রায় ফ্যামিলি মেম্বারের মতোই হয়ে গেছে। ওর বাবা অখিলবাবু আমাদের জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন। ওর মা বিকাশ হবার সময়ই মারা যান। তার বছর দশেক পরে বাপও চলে গেলেন ড্রপসিতে। অনাথ ছেলেটি সঙ্গদোষে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুনে আমার জ্যাঠামশাই ওকে বাড়িতে এনে রাখেন। ইস্কুল কলেজ সবই আমাদের বাড়িতে থেকেই। এমনি বুদ্ধিমান ছেলে। লেখাপড়ায় বেশ ভালই ছিল।

চুরির খবরটা পুলিশে দেননি?

সেই রাত্রেই। এখনও পর্যন্ত কোনও হদিস পায়নি।

গণেশের খবর বাইরের কেউ জানত?

উমানাথবাবু উত্তর দেবার আগেই বিকাশবাবুর সঙ্গে রুক্মিণীকুমার এসে হাজির হল। আমি ভেবেছিলাম ক্যাপ্টেম স্পার্কের ভাগ্যে বুঝি প্রচণ্ড ধমক আছে, কিন্তু দেখলাম উমানাথবাবু সেরকম লোক নন। শুধু আড়চাখে একবার ছেলের দিকে চেয়ে গভীর গলায় বললেন, কাল থেকে পুজোর কাঁটা দিন আর বাইরে যাবে না। বাড়িতে বাগান আছে, ছাত আছে– যত খুশি খেলতে পারো; ঘুড়ি আছে, ঘুড়ি ওড়াতে পারো, বই আছে পড়তে পারো, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছাড়া বাইরে বেরোবে না।

আর শয়তান সিং? ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল রুক্মিণীকুমার!

সে আবার কে?–উমানাথবাবুর বা ভুরুটা উঠে গেছে উপর দিকে।

ও যে কারাগারের শিক ভেঙে পালিয়েছে।

ঠিক আছে, আমি ওর খবর এনে দেব তোমাকে, হালকাভাবে হেসে আশ্বাসের সুরে বললেন বিকাশবাবু। রুকু মনে হল খানিকটা ভরসা পেয়েছে। অন্তত সে তার শাস্তির ব্যাপারে। আর কোনও আপত্তি না করে বিকাশবাবুর হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উমানাথবাবু বললেন, বুঝতেই পারছেন আমার পুত্রটি একটু অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ। যাই হোক।–আপনার প্রশ্নের জবাব দিই এবার- w-গণপতির খবর আমরা দেশে থাকতে অনেকেই জানত। ওটা একটা কিংবদন্তির মতো মুখে মুখে রটে গিয়েছিল। সেটা অবিশ্যি আমার জন্মের আগে। পরের দিকে এ নিয়ে আর বিশেষ কেউ আলোচনা করত না। আমার নিজের ছাত্রজীবন কাটে কলকাতায়। কলেজে থাকতে দু-একটি বন্ধুকে আমি গল্পচ্ছলে গণেশের কথা বলেছিলাম। তার মধ্যে একটি বন্ধু–অবিশ্যি এখন তাকে আর বন্ধু বলি না–সম্প্রতি কাশীতে রয়েছেন। তার নাম মগনলাল মেঘরাজ।

বুঝেছি, ফেলুদা বলল, তাঁকে আজ মছলিবাবার ওখানে দেখলাম। জানি।

আমি যেদিন গেছিলাম সেদিনও ছিল। তার বাবাজীর কাছে যাতায়াত করার একটা কারণ আছে। কিছুদিন থেকে তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। খারাপের দিকে অবশ্যই। বছর দু-এক আগে ওর। প্লাইউডের ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগা থেকে এর শুরু।

তারপর এই গত কয়েক মাসের মধ্যে ওর গোলমেলে কারবার সম্বন্ধে অনেক গুজব বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ওর কলকাতার এবং বেনারসের বাড়িতে পুলিশ রেড হয়ে যায়। আমি এখানে আসার দুদিন বাদেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সোজাসুজি বলল যে গণেশটা ওরা দরকার। ওটা যে কলকাতায় আমার কাছে থাকে না, এখানে

বাবার সিন্দুকে থাকে, সেটা ও জানত। চল্লিশ হাজার অবধি অফার করেছিল ওটার জন্য। আমি সোজাসুজি না বলে দিই। ও যাবার সময় শাসিয়ে যায় যে জিনিসটা ও হাত করে তবে ছাড়বে। তার ঠিক পাঁচদিন পরে গণেশ সিন্দুক থেকে উধাও হয়ে যায়।

ভদ্রলোক চুপ করলেন। ফেলুদাও চুপ, চিন্তিত। আমি জানি ওর তিনমাসের অবসর এখানেই শেষ হল। সামনের কাঁটা দিন কাশীই হবে ওর কাজের জায়গা, তদস্তর জায়গা। লালমোহনবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ছে-এক ঢিলে তিন পাখি। অবিশ্যি ক্যাশের ব্যাপারটা নির্ভর করছে।-

আমাদের খুব ভাগ্য ভাল যে আপনি ঠিক এই সময়ে এসে পড়লেন। আপনার উপর কাজের ভারটা দিতে পারলে-

নিশ্চয়ই। একশোবার! ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়েছে।আপনি অনুমতি দিলে কাল সকালে একবার আসতে চাই। আপনার বাবার সঙ্গে একবার কথা বলা যাবে কি?

কোন যাবে না? বাবার তো এখন রিটায়ার্ড জীবন। অবিশ্যি বাবার মেজাজটা ঠিক যাকে বলে মোলায়েম তা নয়। তবে সেটা বাইরের খোলস। আর আপনি যদি আমাদের বাড়ির এদিক ওদিক ঘুরে দেখতে চান, তাও পারেন স্বচ্ছন্দে। আমি ত্রিলোচনকে বলে রাখব আপনাকে এলে যেন ঢুকতে দেয়। আর. বিকাশ রয়েছে, ও-ও সব ব্যাপারে। আপনাদের হেলপ করতে পারে। আটটা নাগাত এলে ভাল-তা হলে বাবাকে তৈরি অবস্থায় পাবেন।

বাড়ি ফেরার পথে পর পর দুটো অন্ধকার গলি দিয়ে আসবার সময় তিন তিনবার পায়ের আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে চাদর মুড়ি দেওয়া একই লোককে দেখতে পেয়ে সেদিকে ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলাম; ও যে শুধু পাত্তাই দিল না তা নয়-সারা রাস্তা ধরে গুনগুন করে ইশক ইশক ইশক ছবির এমনিতেই একটা বাজে গান সমানে ভুল সুরে গেয়ে গেল।

৪. ক্যালকাটা লজের ঠাকুর

ক্যালকাটা লজের ঠাকুর ফাউল কারিটা দিব্যি রেঁধেছিল। এ ছাড়া রুই মাছের কালিয়া ছিল, রান্নাও ভাল হয়েছিল, কিন্তু লালমোহনবাবু খেলেন না। বললেন, মছলিবাবাকে দেখার পর থেকে আর মাছ খেতে মন চায় না মশাই।

কেন? ফেলুদা বলল, খেলেই মনে হবে বাবাকে চিবিয়ে খাচ্ছেন? আপনার কি ধারণা বাবা নিজে মাছ খান না?

খান বুঝি?

শুনলেন তো বাবা জলেই থাকেন বেশির ভাগ সময়। জলে মাছ ছাড়া আর খাবার কী আছে বলুন! মাছেরাও যে মাছ খায় সেটা জানেন?

লালমোহনবাবু চুপ মেরে গেলেন। আমার বিশ্বাস কাল থেকে উনি আবার মাছ খাবেন।

সারাদিনের নানারকম ঘটনার পর রাত্রে একটা লম্বা ঘুম দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু খানিকটা ব্যাঘাত করলেন রুম-মেট জীবনবাবু। জীবনবাবু মোটা, জীবনবাবু বেঁটে, জীবনবাবুর চাপ দাড়ি, আর জীবনবাবু বালিশে মাথা রাখার দশ মিনিটের মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করেন। ভদ্রলোক একটা ডাক্তারি কোম্পানির রিপ্রেজেনটেটিভ, দুদিন হল এসেছেন, কালই সকালে চলে যাবেন। ফেলুদার সঙ্গে পরিচয় হবার এক মিনিটের মধ্যে ব্যাগ খুলে কোম্পানির নাম খোদাই করা একটা ডট পেন ফেলুদাকে দিয়ে দিলেন—যদিও সেটা ওকে অদ্বিতীয় গোয়েন্দা বলে চিনতে পারার দরুন কিনা বোঝা গেল না।

পরদিন সকালে সাড়ে সাতটার মধ্যে আমরা তিনজন চানটান করে চা ডিম রুটি খেয়ে রেডি। বেরোবার মুখে নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। ফেলুদা দুটো আজেবাজে কথার পর জিজ্ঞেস করল, মগনলাল মেঘরাজের বাড়িটা কোথায় জানেন?

মেঘরাজ? যদ্দূর জানি ওরা দুটো বাড়ি আছে। শহরে, দুটোই একেবারে হার্ট অফ কাশীতে। একটা বোধহয় জ্ঞানবাপীর উত্তর দিকের গলিটায়। আপনি ওখানে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে। পরম ধামিক তো, তাই একেবারে খোদ বিশ্বনাথের ঘণ্টা শুনতে শুনতে টাকার হিসেব করে।

নিরঞ্জনবাবুর কাছ থেকে আরেকটা খবর পেলাম। মছলিবাবা নাকি আর ছদিন আছেন শহরে। কথাটা শুনে ফেলুদা শুধু ওর একপেশে হাসিটা হাসল, মুখে কিছু বলল না।

ঘড়ি ধরে আটটার সময় আমরা শংকরী নিবাসের গেটের সামনে গিয়ে হাজির হলাম।

ত্রিলোচনের চেহারাটা রাত্রে ভাল করে দেখিনি, আজ দিনের আলোতে গালপাট্টার বহর দেখে বেশ হকচকিয়ে গেলাম। বয়স সত্তর-টত্তর হবে নিশ্চয়ই, তবে এখনও মেরুদণ্ড একদম সোজা। আমাদের দেখেই হাসির সঙ্গে একটা স্মার্ট স্যালুট ঠকে গোটটা খুলে দিল।

গাড়িবারান্দার দিকে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই বিকাশবাবু বেরিয়ে এলেন।

জানালা দিয়ে দেখলাম আপনাদের ঢুকতে। ভদ্রলোক বোধহয় সবেমাত্র দাড়ি কামিয়েছেন; বাঁ দিকের জুলপির নীচে এখনও সাবান লেগে রয়েছে। ভেতরে যাবেন? কতামশাই কিন্তু রেডি। আপনি ওঁর সঙ্গেই আগে কথা বলবেন তো?

ফেলুদা বলল, তার আগে আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনে নাট করে নিতে চাই।

বেশ তো, বলুন না। কী জানতে চান।

বিকাশবাবুর কাছ থেকে কতকগুলো তারিখ নোট করে নিয়ে খাতায় যা দাঁড়াল তা এই—

১। মগনলাল উমানাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ১০ই অক্টোবর।

২। উমানাথবাবু তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে মছলিবাবা দর্শনে যান ১৫ই অক্টোবর সন্ধে সাড়ে সাতটায়। বাড়ি ফেরেন সাড়ে আটটার কিছু পরে। এই সময়ের মধ্যেই গণেশ চুরি যায়।

৩। ১৫ই অক্টোবর সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে শংকরীনিবাসে ছিল– উমানাথবাবুর বাবা অম্বিকা ঘোষাল, বিকাশ সিংহ, অম্বিকাবাবুর বেয়ারা বৈকুণ্ঠ, চাকর ভরদ্বাজ, ঝি সৌদামিনী, ঠাকুর নিত্যানন্দ, মালী লক্ষ্মণ, তার বউ আর তাদের একটি সাত বছরের ছেলে, দারোয়ান ত্রিলোচন, প্রতিমার কারিগর শশী পাল ও তাঁর ছেলে কানাই, আর প্রতিমার কাজে জোগান দেবার একজন লোক, নাম নিবারণ। ওই এক ঘণ্টার মধ্যে বাইরে থেকে কেউ না এসে থাকলে বুঝতে হবে এদেরই মধ্যে কেউ না কেউ অম্বিকাবাবুর ঘরে ঢুকে তার টেবিলের দেরাজ থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুলে গণেশ বার করে নিয়েছিল।

খাতায় নোট করা শেষ হলে ফেলুদা বিকাশবাবুর দিকে ফিরে বলল, কিছু মনে করবেন না–এ ব্যাপারে তো কাউকে বাদ দেওয়া চলে না, কাজেই আপনাকেও–

ফেলুদার কথা শেষ হবার আগেই বিকাশবাবু হেসে বললেন, বুঝেছি; এ ব্যাপারটা পুলিশের সঙ্গে এক দফা হয়ে গেছে। আমি সেদিন ওই এক ঘণ্টা সময়টা কী করছিলাম সেটা জানতে চাইছেন তো?

হ্যাঁ–তবে তার আগে একটা প্রশ্ন আছে।

বলুন। -কিন্তু এখানে কেন, আমার ঘরে চলুন।

বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে ডান দিকে দোতলায় যাবার সিঁড়ি, আর বা দিকে বিকাশবাবুর ঘর। বাকি কথা ঘরে বসেই হল।

ফেলুদা বলল, আপনি গণেশের কথাটা জানতেন নিশ্চয়ই।

অনেক’দিন থেকেই জানি।

মগনলাল যেদিন উমানাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন সেদিন আপনি বাড়িতে ছিলেন?

হ্যাঁ। আমিই মগনলালকে রিসিভ করে বৈঠকখানায় বসাই। তারপর ভরদ্বাজকে দিয়ে দোতলায় মিস্টার ঘোষালের কাছে খবর পাঠাই।

তারপর?

তারপর আমি নিজের ঘরে চলে আসি।

দুজনের মধ্যে যে কথাকাটাকাটি হয়েছিল সেটা আপনি জানতেন?

না। আমার ঘর থেকে বৈঠকখানার কথাবার্তা কিছু শোনা যায় না। তা ছাড়া আমার ঘরে তখন রেডিয়ো চলছিল।

যেদিন গণেশটা চুরি গেল, সেদিনও কি আপনি আপনার ঘরেই ছিলেন?

বেশির ভাগ সময়! মিস্টার ঘোষালরা যখন বাইরে যান। তখন আমি ওঁদের গোট পর্যন্ত পৌঁছে দিই। ওখান থেকে যাই পুজোমণ্ডপে। শশীবাবুর কাজ দেখতে বেশ লাগে। সেদিন ভদ্রলোককে দেখে অসুস্থ মনে হল। জিজ্ঞেস করাতে বললেন শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। আমি ঘরে এসে ওষুধ নিয়ে ওকে দিয়ে আসি।

হোমিওপ্যাথিক কি? আপনার শেলফে দুটো হোমিওপ্যাথির বই দেখছি।

হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথিক।

কী ওষুধ জানতে পারি?

পাসসেটিলা থার্টি।

ওষুধ দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন?

হ্যাঁ!

কী করছিলেন ঘরে?

লিখনী রেডিয়ো থেকে আখতারি বাঈয়ের রেকর্ড দিচ্ছিল–তাই শুনছিলাম।

কতক্ষণ রেডিয়ো শোনেন?

ওটা চালানোই ছিল। আমি ম্যাগাজিন পড়ছিলাম। ইলাসট্রেটেড উইকলি।

তারপর মিস্টার ঘোষাল ফেরা না পর্যন্ত আর বাইরে বেরোন নি?

না। বেঙ্গলি ক্লাব কাবুলিওয়ালা থিয়েটার করছে; ওদের তরফ থেকে দুজনের আসার কথা ছিল মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে দেখা করার জন্য।–বোধহয় প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে। ওদের আসার অপেক্ষায় বসে ছিলাম।

ওরা এসেছিলেন?

অনেক পরে। নটার পরে।

ফেলুদা দরজা দিয়ে দোতলায় যাবার সিঁড়িটার দিকে দেখিয়ে বললেন, আপনি যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে ওই সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছিল কি?

হ্যাঁ।

ওটা দিয়ে কাউকে উঠতে বা নামতে দেখেছিলেন বলে মনে পড়ে?

না। তবে ওটা ছাড়াও আরেকটা সিঁড়ি আছে। পিছন দিকে। জমাদারের সিঁড়ি। সেটা দিয়ে কেউ উঠে থাকলে আমার জানার কথা নয়।

বিকাশবাবুর সঙ্গে কথা শেষ করে আমরা ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় অম্বিকাবাবুর ঘরে গেলাম।

জানালার ধারে একটা পুরনো আরাম কেদারায় বসে বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে স্টেটুসম্যান পড়ছেন। পায়ের আওয়াজ পেয়ে কাগজটা সরিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে সোনার চশমার উপর দিয়ে ভ্রূকুটি করে আমাদের দিকে দেখলেন। ভদ্রলোকের মাথার মাঝখানে টাক, কানের দুপাশে ধপধাপে সাদা চুল, দাড়ি গোঁফ কামানো, দু চোখের উপর কাঁচাপাকা মেশানো ঘন ভুরু।

বিকাশবাবু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

অম্বিকাবাবু মুখ খুলতেই বুঝলাম যে ওঁর দুপাটি দাঁতই ফলস। কথা বলার সময় কিটু কিটু করে আওয়াজ হয়, মনে হয় এই বুঝি, দাঁত খুলে পড়ল। প্রথমে সোজা লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, আপনারাও পুলিশ নাকি? লালমোহনবাবু ভড়কে গিয়ে ঢোক গিলে বললেন, আমি? না না-আমি কিছুই না।

কিছুই না? এ আবার কীরকম বিনয় হল?

না। ইনিই, মানে, গো-গো–

বিকাশবাবু এগিয়ে এসে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন।

ইনি প্রদাষ মিত্র। গোয়েন্দা হিসেবে খুব নাম-ডাক। পুলিশ তো কিছুই করতে পারল না, তাই মিস্টার ঘোষাল বলছিলেন...

অম্বিকাবাবু এবার সোজা ফেলুদার দিকে চাইলেন।

উমা কী বলেছে? বলেছে। গণেশ গেছে বলে ঘোষাল বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। ননসেন্স। তার বয়স কত। চল্লিশ পেরোয়নি। আমার তিয়াত্তর। ঘোষাল বংশের ইতিহাস সে আমার চেয়ে বেশি জানে? উমা ব্যবসায়ে উন্নতি করেছে সে কি গণেশের দৌলতে? নিজের বুদ্ধিশুদ্ধি না থাকলে গণেশ কী করবে? আর তার যে বুদ্ধি সে কি গণেশ দিয়েছে? সে বুদ্ধি সে পেয়েছে তার বংশের রক্তের জোরে। নাইনটিন টোয়েন্টিফোরে কেমব্রিজে ম্যাথাম্যাটিকস-এ ট্রাইপস করতে যাচ্ছিল অম্বিকা ঘোষাল—যাকে দেখছ তোমাদের সামনে। যাবার সাতদিন আগে পিঠে কারবাঙ্কল হয়ে যায় যায় অবস্থা। বাঁচিয়ে দিল না হয়। গণেশ, কিন্তু বিলেত যাওয়া যে পাণ্ড হয়ে গেল চিরকালের জন্যে, তার জন্য কে দায়ী?..উমানাথের ব্যবসা বুদ্ধি আছে ঠিকই, তবে ওর জন্মানো উচিত ছিল একশো বছর আগে। এখন তো শুনছি। নাকি কোন এক বাবাজীর কাছে দীক্ষা নেবার মতলব করছে।

তার মানে আপনার গণেশটা যাওয়াতে কোনও আপশোঁস নেই?

অম্বিকাবাবু চশমা খুলে তার ঘোলাটে চোখ দুটো ফেলুদার মুখের উপর ফোকাস করলেন।

গণেশের গলায় একটা হিরে বসানো ছিল সেটার কথা উমানাথ বলেছে?

তা বলেছেন।

কী হিরে তার নাম বলেছে?

না, সেটা বলেননি।

ওই তো। জানে না। তাই বলেনি। বনস্পতি হিরের নাম শুনেছ?

সবুজ রঙের কি?

ফেলুদার এই এককথায় অম্বিকাবাবু নরম হয়ে গেলেন। দৃষ্টিটা নামিয়ে নিয়ে বললেন, অ, তুমি এ বিষয়ে কিছু জানটান দেখছি। অত্যন্ত রেয়ার হিরে। আমার আপশোঁস হয়েছে।

কেন জান? শুধু দামি জিনিস বলে নয়; দামি তো বটেই; ওটার জন্য কত ট্যাক্স দিতে হচ্ছিল শুনলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। আসল কথা হচ্ছে—ইট ওয়জ ও ওয়র্ক অফ আর্ট। এসব লাকটাক আমি বিশ্বাস করি না।

ওই টেবিলের দেরাজেই কি চাবিটা ছিল? ফেলুদা প্রশ্ন করল। অম্বিকাবাবুর আরাম কেদারা থেকে তিন-চার হাত দূরেই দুটো জানালার মাঝখানে টেবিলটা। এটা ঘরের দক্ষিণ দিক। সিন্দুকটা রয়েছে উত্তর-পশ্চিম কোণে। দুটোর মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড আদ্যিকালের খাট, তার উপর একটা ছ ইঞ্চি পুরু তোশকের উপর শীতলপাটি পাতা। অম্বিকাবাবু ফেলুদার প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে উলটে আরেকটা প্রশ্ন করে বসলেন।

আমি সন্ধেবেলা নেশা করি সেটা উমা বলেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ফেলুদা এত নরমভাবে কারুর সঙ্গে কোনওদিন কথা বলেনি। অম্বিকাবাবু বললেন, গণেশ নাকি চাইলে সিদ্ধি দেন; আমি খাই আফিং। সন্ধের পর আমার বিশেষ ভঁশ থাকে। না। কাজেই সাতটা থেকে আটটার মধ্যে আমার ঘরে কেউ এসেছিল কি না সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করে ফল হবে না।

আপনার চেয়ার এখন যে ভাবে রাখা রয়েছে, সন্ধেবেলাও কি সেইভাবেই থাকে?

না। সকালে কাগজ পড়ি, তাই জানালা থাকে আমার পিছনে। সন্ধেয় আকাশ দেখি, তাই জানালা থাকে সামনে।

তা হলে টেবিলের দিকে পিঠ করা থাকে। তার মানে ওদিকের দরজা দিয়ে কেউ এলে দেখতেই পাবেন না।

না।

ফেলুদা এবার টেবিলটার দিকে এগিয়ে গিয়ে খুব সাবধানে টান দিয়ে দেরাজটা খুলল। কোনও শব্দ হল না; বন্ধ করার বেলাতেও তাই।

এবার ও সিন্দূকটার দিকে এগিয়ে গেল। চৌকির উপরে রাখা পোল্লায় সিন্দুকটা প্রায় আমার বুক অবধি পৌঁছে গেছে!

পুলিশ নিশ্চয়ই এটার ভিতর ভাল করে খুঁজে দেখেছে?

বিকাশবাবু বললেন, তা তো খুঁজেইছে, আঙুলের ছাপের ব্যাপারেও পরীক্ষা করে দেখেছে, কিছুই পায়নি।

অম্বিকাবাবুর ঘরের দরজা দিয়ে বেরোলে ডাইনে পড়ে নীচে যাবার সিঁড়ি, আর বাঁয়ে একটা ছোট্ট ঘর। ঘরটা দিয়ে ডান দিকে বেরিয়ে একটা চওড়া শ্বেত পাথরে বাঁধানো বারান্দা। এটা বাড়ির দক্ষিণ দিক। পুব দিকে বাগানের নিম আর তেঁতুল গাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরে গঙ্গার জল সকালের রোদে চিক্‌চিক্ করছে। আমাদের সামনে আর ডাইনে বেনারস শহর ছড়িয়ে আছে। আমি মন্দিরের চুড়ো গুনছি, ফেলুদা বিকাশবাবুকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা মুখে পুরেছে, এমন সময় ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে উপর দিক থেকে কী যেন একটা জিনিস। পাক খেতে খেতে নেমে এসে লালমোহনবাবুর পাঞ্জাবির উপর পড়ল। লালমোহনবাবু সেটা খপ করে ধরে হাতের মুঠো খুলতেই দেখা গেল সেটা আর কিছুই না—একটা চুইং গামের র‍্যাপার।

রুক্মিণীকুমার ছাতে আছেন বলে মনে হচ্ছে? ফেলুদা বলল।

আর কোথায় থাকবে বলুন, বিকাশবাবু হেসে বললেন, তার তো এখন বন্দি অবস্থা। আর তা ছাড়া ছাতে তার একটি নিজস্ব ঘর আছে।

সেটা একবার দেখা যায়?

নিশ্চয়ই। সেই সঙ্গে চলুন পিছনের সিঁড়িটাও দেখিয়ে দিই।

একরকম লোহার সিড়ি হয় যেগুলো বাড়ির বাইরের দেয়াল বেয়ে পাক খেয়ে উপরে উঠে। যায়। এটা দেখলাম সেরকম সিঁড়ি নয়। এটা ইটের তৈরি, আর বাড়ির ভিতরেই। তবে এটাও পাকানো সিঁড়ি। ওঠবার সময় ঠিক মনে হয় কোনও মিনার বা মনুমেন্টে উঠছি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই ছাতের ঘর, আর বাঁ দিকে ছাতে যাবার দরজা। ঘরের ভিতরে মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে রুকু। একটা লাল-সাদা পেটকাটি ঘুড়ি মাটিতে ফেলে হাঁটুর চাপে সেটাকে ধরে রেখে তাতে সুতো পরাচ্ছে। আমাদের আসতে দেখেই কাজটা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসল। আমরা চারজনে ছোট্ট ঘরটাতে ঢুকলাম।

বোঝাই যায়। এটা রুকুর খেলার ঘর—যদিও রুকুর জিনিস ছাড়াও আরও অনেক কিছু কোণঠাসা করে রাখা রয়েছে—দুটো পুরনো মরচে ধরা ট্রাঙ্ক, একটা প্যাকিং কেস, একটা ছেঁড়া মাদুর, তিনটে হারিকেন লণ্ঠন, একটা কাত করা ঢাকাই জালা, আর কোণে ডাই করা পুরনো খবরের কাগজ আর মাসিক পত্রিকা।

তুমি গোয়েন্দা?

ফেলুদার দিকে সটান একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রুকু। আজ দেখছি ফরসা রংটা রোদে পুড়ে যেন একটু তামাটে লাগছে। তার মুখে যে চুইং গাম রয়েছে সেটা তার চায়াল নাড়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ফেলুদা হেসে বলল, খবরটা ক্যাপ্টেন স্পার্ক কী করে পেলেন সেটা জানতে পারি!

আমার অ্যাসিসট্যান্ট বলেছে, গভীর ভাবে জানাল রুকু। সে আবার ঘুড়ির দিকে মন দিয়েছে।

কে তোমার অ্যাসিসট্যান্ট? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

স্পার্কের অ্যাসিসট্যান্ট খুদে র‍্যাক্সিট সেটা জান না? তুমি কীরকম গোয়েন্দা।

লালমোহনবাবু ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে তাঁর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, খুদিরাম রক্ষিত। সাড়ে চার ফুট হাইট। স্পার্কের ডান হাত।

ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বলল, কোথায় আছে তোমার অ্যাসিসট্যান্ট?

উত্তরটা এল বিকাশবাবুর কাছ থেকে। ভদ্রলোক একটা অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন, ও ভূমিকাটা এখন আমাকেই পালন করতে হচ্ছে।

তোমার রিভলভার আছে? হঠাৎ প্রশ্ন করল রুকু।

আছে, বলল ফেলুদা।

কী রিভলভার?

কোল্ট।

আর হারপুন?

উঁহু। হারপুন নেই।

তুমি জলের তলায় শিকার করো না?

এখন পর্যন্ত প্রয়োজন হয়নি।

তোমার ছোরা আছে?

ছোরাও নেই। এমনকী এরকম ছোরাও নেই।

রুকুর মাথার উপরেই দেয়ালে পেরেক থেকে একটা খেলার ছোরা ঝুলছে! এটাই কাল ওর কোমরে বাঁধা দেখেছিলাম।

ওই ছোরা আমি শয়তান সিং-এর পেটে ঢুকিয়ে ওর নাড়িভুঁড়ি বার করে দেব।

সে তো বুঝলাম, ফেলুদা রুকুর পাশে মেঝেতে বসে পড়ে বলল, কিন্তু তোমাদের বাড়ির সিন্দুক থেকে যে একজন শয়তান সিং একটা সোনার গণেশ চুরি করে নিয়ে গেল তার কী হবে?

শয়তান সিং এবাড়িতে ঢুকতেই পারবে না।

ক্যাপ্টেন স্পার্ক সেদিন মছলিবাবাকে দেখতে না গেলে এ ব্যাপারটা হত না-তাই না?

মছলিবাবার গায়ের রংটা কঙ্গোর গঙ্গোরিলার মতো কালো।

সাবাস! বলে উঠল লালমোহনবাবু, তুমি গোরিলার গোগ্রাস পড়েছ রুকুবাবু?

গঙ্গোরিলা যে লালমোহনবাবুরই লেখা গোরিলার গোগ্রাস-এর নব্বই ফুট লম্বা অতিকায় রাক্ষুসে গোরিলার নাম সেটা আমি জানতাম। গল্পের আইডিয়াটা কিং কং থেকে নেওয়া, সেটা লালমোহনবাবু নিজেও স্বীকার করেন। জটায়ুর বর্ণনায় গোরিলার গায়ের রং ছিল কষ্টিপাথরে আলকাতরা মাখালে যেরকম হয় সেইরকম। লালমোহনবাবু ও বইটা আসলে আম-বলেই ফেলুদার কাছ থেকে একটা কড়া ইশারা পেয়ে থেমে গেলেন।

রুকু বলল, গণেশ তো একজন রাজার কাছে আছে। শয়তান সিং পাবেই না। কেউ পাবে না। ডাকু গণ্ডারিয়াও পাবে না।

আবার অক্রুর নন্দী!-দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন জটায়ু।

বিকাশবাবু হেসে বললেন, ওর কথার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে আগে রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ গুলে খেতে হবে।

ফেলুদা এখনও মাটিতে বসে আড়চোখে রুকুর দিকে চেয়ে আছে, তার ভাব দেখে মনে হয় যেন সে রুকুর আজগুবি কথাগুলোর ভিতর থেকে আসল মানুষটাকে খুঁজে বার করার

চেষ্টা করছে। রুকু তার কথার মধ্যেই দিব্যি ঘুড়িতে সুতো লাগিয়ে চলেছে। এবার ফেলুদা প্রশ্ন করল, কোথাকার রাজার কথা বলছি তুমি রুকু?

উত্তর এল–আফ্রিকা।

ঘোষালবাড়ি থেকে চলে আসার আগে আমরা আরেকজন লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি হলেন শশিভূষণ, পাল। শশীবাবু নারকোলের মালায় হলদে রং নিয়ে নিজের তৈরি তুলি দিয়ে কার্তিক ঠাকুরের গালে লাগাচ্ছিলেন। ভদ্রলোকের বয়স ষাট পয়ষট্টি হবে নিশ্চয়ই, রোগ প্যাকাটি চেহারা, চোখে পুরু কাচের চশমা! ফেলুদা জিজ্ঞেস করাতে বললেন উনি নাকি ষোলো বছর বয়স থেকে এই কাজ করছেন। ওঁর আদি বাড়ি ছিল কৃষ্ণনগর, ঠাকুরদাদা অধর পাল নাকি প্রথম কাশীতে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। সিপাহি বিদ্রোহের দু বছর পরে। শশীবাবু থাকেন। গণেশ মহল্লায়। সেখানে নাকি ওঁরা ছাড়াও আরও কয়েকঘর কুমোর থাকে। ফেলুদা বলল, আপনার জ্বর হয়েছিল শুনলাম; এখন ভাল আছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সিংহি মশাইয়ের ওষুধে খুব উপকার হয়েছিল।

শশীবাবু কথা বলছেন, কিন্তু কাজ বন্ধ করছেন না।

আপনার কাজ শেষ হচ্ছে কবে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

আজ্ঞে পরশুই তো ষষ্ঠী! কাল রাত্তিরের ভেতরই হয়ে যাবে। বয়স হয়ে গেল তো, তাই কাজটা একটু ধরে করতে হয়।

তাও আপনার তুলির টানে এখনও দিব্যি জোর আছে।

আজ্ঞে এ কথা। আপনি বলছেন, আর, আরবছর এই দুগ্ধঠাকুর দেখেই ওই একই কথা বলেছিলেন কলকাতার আর্ট ইস্কুলের একজন শিক্ষক। এ জিনিসের কদর আর কে করে বলুন! সবাই ঠাকুরই দেখে, হাতের কাজটা আর কজন দেখে।

বিকাশবাবু যেদিন আপনাকে ওষুধ দেন, সেদিনই সন্ধ্যায় বাড়ির দোতলার সিন্দুক থেকে একটা জিনিস চুরি যায়। এ খবর আপনি জানেন?

শশীবাবুর হাতের তুলিটা যেন একমুহূর্তের জন্য কেঁপে গেল। গলার সুরাটাও যেন একটু কাঁপা; বললেন–

আজ পঞ্চাশ বছর হল প্রতি বছর এসে এই একই কাজ করে যাচ্ছি। এই ঘোষালবাড়িতে, আর আমায় কিনা এসে পুলিশে জেরা করল! হাতে তুলি নিলে আমার আর কোনও ইশ থাকে না, জানেন, নাওয়া খাওয়া ভুলে যাই। আপনি জিজ্ঞেস করুন সিংহি মশাইকে, উনি তো মাঝে মাঝে এসে দাঁড়িয়ে দেখেন। আপনি খোকাকে জিজ্ঞেস করুন। সেও তো এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে দেখে আমার কাজ। কই বলুন তো তাঁরা–আমি ঠাকুরের সামনে ছেড়ে একটা মিনিটের জন্যে কোথাও যাই কি না।

শশীবাবুর সঙ্গে আরেকটি বছর কুড়ির ছেলে কাজ করছে। জানলাম ইনিই হলেন শশীবাবুর ছেলে কানাই। কানাইকে তার ঝাপের একটা ইয়াং সংস্করণ বলা চলে। কাজ দেখলে মনে হয় সে বংশের ধারা বজায় রাখতে পারবে। কানাই নাকি গণেশ চুরির দিন সাতটার পরে ঠাকুরের সামনে ছেড়ে কোথাও যায়নি।

বিকাশবাবু আমাদের সঙ্গে গেট অবধি এলেন। ফেলুদা বলল, আপনাদের বাড়িতে এখন অনেক লোক তাই আর উমানাথবাবুকে বিরক্ত করলাম না। আপনি শুধু বলে দেবেন যে আমি হয়তো মাঝে মাঝে এসে একটু ঘুরে টুরে দেখতে পারি, প্রয়োজন হলে একে-ওকে দু-একটা প্রশ্ন করতে পারি।

বিকাশবাবু বললেন, মিস্টার ঘোষাল যখন আপনার উপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েছেন তখন তো আপনার সে অধিকার আছেই।

বেরোবার মুখে একটা শব্দ পেয়ে ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখটাও বাড়ির ছাতের দিকে চলে গেল।

রুকু তার লাল-সাদা পেটকাটিটা সবে মাত্র উড়িয়েছে। সূতোর টানে ঘুড়িটাই হাওয়া কেটে ফরফর শব্দ করছে। রুকুকে এখান থেকে দেখতে পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই, তবে তার লাটাই সমেত হাত দুটো মাঝে মাঝে ছাতের পাঁচিলের উপর দিয়ে উঁকি মারছে।

ছেলেটিকে খুব একা বলে মনে হয়, ফেলুদা ঘুড়িটার দিকে চোখ রেখে বলল। সত্যিই কি তাই?

বিকাশবাবু বললেন, রুকু উমানাথবাবুর একমাত্র ছেলে। এখানে তো তবু একটি বন্ধু হয়েছে। আপনি তো দেখেছেন সূর্যকে। কলকাতায় ওর সমবয়সী বন্ধু একটিও নেই।

৫. আমরা কাশীতে এসেছি

এখানে এসে অবধি বেশির ভাগ সময়টা ঘরে বসে বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলে মাঝে ভুলে যেতে হচ্ছিল যে আমরা কাশীতে এসেছি। এখন সাইকেল রিকশা, টাঙ্গা আর লোকের ভিড় বাঁচিয়ে মদনপুরা রোড দিয়ে হাটেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আবার কাশীর মেজাজটা ফিরে পেলাম। বড় রাস্তার গোলমাল এড়িয়ে হোটেলে যাবার শর্টকাটের গলিটাতে ঢুকলাম আমরা তিনজনে। লালমোহনবাবু একটা ছাগলের বাচ্চার পিঠে ছাতা দিয়ে একটা ছোট খোঁচা মেরে বললেন, আমার একটা ব্যাপার কী জানেন ফেলুবাবু– কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও। গেলেই সেই জায়গার মেজাজটা আমাকে কেমন যেন পেয়ে বসে। সেবার রাজস্থান গিয়ে খালি খালি নিজেকে রাজপুত বলে মনে হচ্ছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে মাথায় হাত দিয়ে পাগড়ির বদলে টাক ফিল করে রীতিমতো চমকে চমকে উঠছিলুম।

এখানে এসে কি জটার অভাব ফিল করে চমকে চমকে উঠছেন?

তা ঘাটে গিয়ে যে একটু বৈরাগী-বৈরাগী ভাব হয়নি তা বলতে পারি না। আবার এই সব অলিগলিতে ঢুকলে মনে হয় কোমরে একটা ছোরা থাকলে হাতলটিতে মাঝে মাঝে বেশ হাত বোলানো যেত।

আমি কিন্তু কালকের সেই লোকটাকে আবার দেখেছি। আমি জানি শংকরী-নিবাস থেকে বেরোবার কিছু পরেই সে আমাদের পিছু নিয়েছে। কিন্তু কালকে ফেলুদার তাচ্ছিল্য ভাবের পর আজ আর কিছু বলতে পারছি না। সকালবেলা গলিতে বিস্তর লোক-কেউ স্নান করে ফিরছে, কেউ বাজার থেকে ফিরছে, কিছু বুড়ো দাওয়ায় বসে আড্ডা মারছে, এখানে ওখানে বাচ্চার দল হইহল্লা করছে।–তারই মধ্যে পিছন ফিরলে চাপা পায়জামার উপর গাঢ় বেগনি চাদর মুড়ি দেওয়া লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বিশ-ত্রিশ হাত পিছনে সমানে আমাদের ফলো করে চলেছে।

লালমোহনবাবু বললেন, আপনার এই গণেশের মামলাটি বিলক্ষণ ডিফিকাল্ট বলে মনে হচ্ছে মশাই।

ফেলুদা বলল, কোনও মামলা একটা বিশেষ অবস্থায় পৌঁছানোর আগে সেটা সহজ কি কঠিন তা বোঝা সম্ভব নয়। আপনার কি ধারণা সেই স্টেজ পৌঁছে গেছে?

যায়নি বুঝি?

একেবারেই না।

কিন্তু যিনি আসল ভিলেন, তাঁর পক্ষে তো ও জিনিস চুরি করার কোনও স্কোপই ছিল না।

কাকে ভিলেন ভাবছেন আপনি?

কেন, ওই যে মেঘরাম না মেঘলাল না। কী নাম বললে। যাকে দেখলুম মছলিবাবার ওখানে।

আপনার কি ধারণা মেঘরাজ গণেশ চুরি করার জন্য নিজেই পাঁচিল টপকে ঘোষাল

বাড়িতে ঢুকবেন?

এজেন্ট লাগবে বলছেন?

সেটাই স্বাভাবিক নয় কি? আর তা ছাড়া সে শাসিয়ে গেছে বলে যে সে-ই চুরি করেছে। এমন তো নাও হতে পারে।

লালমোহনবাবু একটুক্ষণ চুপ মেরে হঠাৎ যেন শিউরে উঠে বললেন, ওরকম কাঁধ দেখিনি মশাই। না জানি সামনের দিক থেকে কী রকম দেখতে। ওর মাথায় এক জোড়া শিং লাগিয়ে বিশ্বনাথের গলিতে ছেড়ে দিলে নিঘ্‌ঘাৎ ঢুঁ মারবে।

ক্যালকাটা লজে ঢুকে সামনেই আপিসঘর। ম্যানেজারের চেয়ার ছাড়া আরও তিনটে চেয়ার আর একটা বেঞ্চি আছে। সেগুলোতে দু-তিনজন করে নিরঞ্জনবাবুর আলাপী লোক প্রায় সব সময়ই বসে আড্ডা মারে। আজ ঢুকে দেখলাম নিরঞ্জনবাবুর উলটা দিকে একজন প্যান্ট-শার্ট পরা বেশ জোয়ান লোক বসে চা খাচ্ছেন, আর হাত নেড়ে নিরঞ্জনবাবুকে কী যেন বোঝাচ্ছেন। আমাদের ঢুকতে দেখেই ম্যানেজারমশাই পানীমুখে একগাল হেসে বললেন, এই তো–ইনি আপনার জন্য প্রায় কুড়ি মিনিট বসে। আলাপ করিয়ে দিই–সাব-ইনস্পেক্টর। তেওয়ারি–আর ইনি–

নিরঞ্জনবাবু পর পর আমাদের তিনজনের নাম বলে বললেন, ভয় নেই–হিন্দি বলতে হবে না–ইনি দিব্যি বাংলা বলেন।

তেওয়ারি ফেলুদার দিকে একদৃষ্টি চেয়ে আছেন। চোখের কোণে হাসি এই এল বলে, আর ফেলুদার চোখে ভ্রূকুটি, সেটাও মনে হচ্ছে একটা হাসির অপেক্ষায় রয়েছে।

সে কী মশাই-ফেলুদার ভ্রূকুটি হাওয়া–আপনি এলাহাবাদে ছিলেন না?

দারোগাসাহেব ঝকঝকে দাঁত বার করে হেসে ফেলুদার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, আমি শিওর ছিলাম না। আপনি চিনবেন কি না।

চেনা মুশকিল। গোঁফটা যা ছিল তার চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে। রোগাও হয়েছেন বেশ খানিকটা।

ভদ্রলোক ফেলুদার সমান লম্বা আর গড়নেও ফেলুদারই মতো ছিমছাম। বছর দু-এক আগে এলাহাবাদে ফেলুদার একটা কেস পড়েছিল। পুলিশ প্যাচে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফেলুদা দু-দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করে দিয়ে চার দিনের ভিতর কলকাতায় ফিরে এসেছিল। বুঝলাম সেইবারই তেওয়ারির সঙ্গে আলাপ হয়।

আমি মিস্টার ঘোষালের কাছে গিয়েছিলাম কাল রাত্রে আপনি চলে আসার পর। তখনই শুনলাম। আপনি এসেছেন। আর ক্যালকাটা লজে আছেন।

নিরঞ্জনবাবু চায়ের অর্ডার দিয়েছেন, আমরা তিনজনে বসলাম! ফেলুদা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, যাক!–মিস্টার ঘোষাল পুলিশের কথা বলতে আমার একটু দুশ্চিন্তা যাচ্ছিল; এখন আপনাকে দেখে অনেকটা হালকা লাগছে। আপনার সঙ্গে ক্ল্যাশ হবে না; আর মনে হয় দুটো মাথা এক করলে বোধহয় কাজের সুবিধেই হবে। বেশ গোলমেলে ব্যাপার–তাই না মশাই?

তেওয়ারি একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, ইন ফ্যাক্ট ইট ইজ সো গোলমেলে যে আমি তো আপনাকে এলাম বারণ করতে।

কেন বলুন তো?

মগনলাল যে বেপারে আছে, সে বেপারে এই হচ্ছে আমার অ্যাডভাইস। আপনি দুদিন গেলেন মিস্টার ঘোষালের বাড়ি, তার জন্য আমার খুব ভাওনা হচ্ছে। আপনাকে খুব সাওধান থাকতে হবে। ওর স্পাই আর ভাড়াটে গুণ্ডা সারা বেনারস শহরে ছড়িয়ে আছে।

হরকিষণ চা নিয়ে এল। ফেলুদা চিন্তিতভাবে একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল, কিন্তু মগনলাল যে এ ব্যাপারে সত্যিই জড়িত সে সম্বন্ধে আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?

মিস্টার তেওয়ারি ভুরুটা কুঁচকে বা হাতের আঙুলগুলো দিয়ে টেবিলের উপর কয়েকটা টোকা মেরে বললেন, আমরা যে লাইনে ইনভেস্টিগেশন করছি, তাতে মগনলালকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। ওর মতো কানিং লোক আর নেই।

আপনারা কোন লাইনে তদন্ত চালাচ্ছেন সেটা...

বলছি আপনাকে। আপনার কাছে আমি কিছুই লুকাব না। ঘোষালবাড়ির সবাইয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে কি?

চাকর-বাকির বাদে আর মোটামুটি সকলের সঙ্গেই হয়েছে।

শিশীবাবুকে দেখেছেন তো?

হ্যাঁ, দেখেছি বই কী। আজই সকলে তার সঙ্গে কথা হয়েছে।

ওর ছেলেটিকে দেখেছেন নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ-সেও তো কাজ করছিল।

কিন্তু শশীবাবুর আরেকটি ছেলে আছে সেটা জানেন?

এ খবরটা অবিশ্যি আমরা কেউই জানতাম না! এ ছেলেটির নাম নিতাই। ভেরি ব্যান্ড টাইপ। আঠারো বছর বয়েস, আর এ বয়সে যত খারাপ দোষ থাকতে পারে, সবই আছে।

আমরা এখনও কোনও প্রমাণ পাইনি, কিন্তু ধরুন, যদি সে মগনলালের খপ্পরে পড়ে থাকে-

ফেলুদা হাত তুলে বলল, বুঝেছি। মগনলাল নিতাইকে হাত করবে, নিতাই হয় তার বাপকে না হয় দাদাকে হুমকি দিয়ে তাদের সিন্দুক খুলিয়ে গণেশ চুরি করবে।

এগজ্যাক্টলি, বললেন মিস্টার তেওয়ারি। নিতাইয়ের ব্যাপারটা জানার পর থেকেই মনে হচ্ছে একটা রাস্তা পাওয়া গেছে। আমার অ্যাডভাইস আপনি এখন চুপচাপ থাকুন। দসেরা টাইমে বেনারসে অনেক কিছু দেখবার আছে-সেই সব দেখুন, কিন্তু ঘোষালবাড়িতে বেশি। যাতায়তা করবেন না।

ফেলুদা অল্প হেসে চায়ে চুমুক দিয়ে একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

আপনারা মছলিবাবা সম্বন্ধে কোনও তদন্ত করার প্রয়োজন বোধ করছেন না?

তেওয়ারি হাতের কাপটা টেবিলের উপর রেখে একটা প্রাণখোলা হাসি হেসে বলল, আপনাদের এর ভিতরেই মছলিবাবা দর্শন হয়ে গেছে? কী মনে হল?

তদন্তের কথা যখন তুললাম, তখন খুব যে একটা ভক্তি জাগেনি মনে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

সে তো আপনার কথা হল, কিন্তু আপনি তার ভক্তদের দেখেছেন? আপনি ইনভেস্টিগেশনের কথা বলছেন—খোলাখুলি ভাবে কিছু করতে গেলে ভক্তরা আমাদের আস্ত রাখবে?

কথাটা বলে মিস্টার তেওয়ারি আড়াচোখে নিরঞ্জনবাবুর দিকে চাইতে ভদ্রলোক হাত তুলে বলে উঠলেন, আমার দিকে কী দেখছেন মশাই! আমাদের ভক্তি মানে কী? ভক্তিটক্তি কিচ্ছু না—মছলিবাবা হলেন আমাদের ছকে ফেলা একঘেয়ে জীবনে সামান্য একটু ব্যতিক্রমের ছিটেফোঁটা-ব্যাস।

ফেলুদা বলল, একটা জিনিস আপনি করতে পারেন মিস্টার তেওয়ারি-হরিদ্বার আর এলাহাবাদে খবর নিয়ে দেখতে পারেন। সেখানে গত মাসখানেকের মধ্যে মছলিবাবা নামে কোনও সিদ্ধপুরুষের আবিভব ঘটেছিল কি না।

ভেরি গুড। এটা করতে কোনও অসুবিধা নেই। আমি দু দিনের মধ্যে আপনাকে ইনফরমেশন এনে দেব।

দারোগাসাহেব ঘড়ি দেখে উঠে পড়লেন। দরজার মুখে ভদ্রলোক ফেলুদার পিঠ চাপড়ে বললেন, এক'দিন চৌকে আমাদের থানায় আসুন না। কী রকম কাজ হচ্ছে দেখে যান। আর–, তেওয়ারি গভীর-আমি আপনাকে সিরিয়াসলি বলছি-আপনি যত ইচ্ছে হলিডে করুন, কিন্তু এ বেপারে জড়াবেন না।

দুপুরের ডাল ভাত কপির তরকারি মাছের ঝোল আঁর দইয়ের সঙ্গে জিলিপি খেয়ে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পান। কিনলাম। লালমোহনবাবুকে এমনিতে কখনও পান খেতে দেখিনি; এখানে দেখলাম সাত রকম মশলা দেওয়া রুপোর তত্ত্বক দিয়ে মোড়া একটা প্রকাণ্ড পান চার আঙুল দিয়ে ঠেলে মুখের ভিতর পুরে দিব্যি চিবোতে লাগলেন। আমরা কোনও বিশেষ জায়গায় যাব বলে বেরিয়েছি কি না জানি না, কারণ ফেলুদা কিছু বলেনি। লালমোহনবাবু একবার আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, তোমার দাদা বোধহয় সেই হালুইকরের দোকানে গিয়ে রাবাড়ি খাবেন। আমার ধারণা। কিন্তু অন্য রকম-যদিও সেটা আমি মুখে প্রকাশ করলাম না! ফেলুদাকে অনুসরণ করে আমরা হাটেলের উলটা দিকে একটা গলিতে ঢুকে এগিয়ে চললাম।

একটু এগিয়ে বুঝতে পারলাম। এদিকটায় বাঙালির নামগন্ধ নেই। লালমোহনবাবু চান্দরটিকে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, আপনি চোখ, কান আর নাকের কথা

বললেন, কিন্তু টেমপারেচারের কথা তো বললেন না। এদিকটায় বেশ শীত শীত লাগছে মশাই।

দুদিকে তিন তলা চার তলা বাড়ি উঠে গেছে, আর তার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে। গলি। সূর্যের আলো প্রায় পৌঁছায় না বললেই চলে। ফেলুদা বলল, বেনারসের গলির বেশির ভাগ বাড়িই নাকি দেড়শো থেকে দুশো বছরের পুরনো। রাস্তার দু দিকের দেওয়ালে যেখানে সেখানে ছবি আঁকা-হাতি, ঘোড়া, বাঘ, টিয়া, ঘোড়সওয়ার; কারা কখন ঐকেছে। জানি না, কিন্তু দেখতে বেশ লাগে? মাঝে মাঝে এক-একটা হাতে-লেখা হিন্দি বিজ্ঞাপন-তার মধ্যে নওজোয়ান বিড়ি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে।

এতক্ষণ চারিদিকে বেশ চুপচাপ ছিল– এবার ক্রমে ক্রমে ক্যানে নানারকম নতুন শব্দ আসতে আরম্ভ করল। তার মধ্যে সব ছাপিয়ে উঠছে ঘণ্টার শব্দ। ঘণ্টার ফাঁকগুলো ভরিয়ে রেখেছে যে শব্দটা তাকেই বলা হয় কোলাহল। ফেলুদা বলে এই কোলাহল জিনিসটা খুব মজার। হাজার লোক এক জায়গায় রয়েছে, সবাই নিজেদের মধ্যে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলছে, কেউ গলা তুলছে না, অথচ সব মিলিয়ে যে শব্দটা হচ্ছে তাতে কান ফেটে যাবার জোগাড়।

এরই মধ্যে বেশ কয়েকটা ষাঁড় আমাদের সামনে পড়েছে, আর প্রতিবারই লালমোহনবাবু বলে উঠেছেন, ওই দেখুন, মেঘরাম? শেষটায় ফেলুদা বলতে বাধ্য হল যে তার ধারণা মেঘরাজের চেয়ে ষাঁড় জিনিসটা অনেক বেশি নিরীহ এবং নিরাপদ। –আমি মশাই একজন ডাকসাইটে প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করে মনে উৎসাহ আনার চেষ্টা করছি, আর আপনি বার বার ষাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করে তাকে খাটা করছেন।

চোখ, কান আর নাককে একসঙ্গে আক্রমণ করতে বিশ্বনাথের গলির মতো আর কিছু আছে কি না জানি না। এখানে এসে আর নিজের ইচ্ছেমতো হাঁটা যায় না; ভিড় যে দিকে নিয়ে যায়। সেই দিকে যেতে হয়। আমরাও এগিয়ে চললাম ভিড়ের সঙ্গে! দর্শন হবে বাবু? বাবু বিশ্বনাথ দর্শন হবে? পাণ্ডার চারিদিক থেকে ছেকে ধরেছে। ফেলুদা নির্বিকার।

আমরা তিনজনেই তাদের কথায় কান না দিয়ে যদ্দূর পারি ধাক্কা বাঁচিয়ে পকেট বাঁচিয়ে রাস্তার পিছল জায়গাগুলো বাঁচিয়ে এগিয়ে চললাম। লালমোহনবাবুর মনে যতই ভক্তিভাব জাগুক না কেন, ওঁর চোখ কিন্তু চলে গেছে। মন্দিরের সোনায় মোড়া চুড়োর দিকে। একবার ফেলুদাকে কী যেন প্রশ্নও করলেন চুড়োর দিকে আঙুল দেখিয়ে। গোলমালে কী বললেন শুনতে পেলাম না, তবে ক্যারেট কথাটা কানে এল। চুড়ের দিকে চাইতে গিয়েই চোখে পড়ল আকাশে দশ-বারোটা চিল চক্কর দিচ্ছে, আর তারই এক পাশে একটা লাল-সাদা পেটকাটি ঘুড়ি গোঁৎ খেয়ে মন্দিরের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফেলুদাও ঘুড়িটাকে দেখেছে।

আমরা দুজন ফেলুদারই পিছন পিছন আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম-যদি আবার ঘুড়িটাকে দেখা যায়। হ্যাঁ-ওই তো আবার দেখা যাচ্ছে-লাল-সাদা পেটকাটি। ওই তো উপর দিকে উঠল, আর ওই তো আবার গোঁৎ খেয়ে নীচের দিকে নেমে একটা চারতলা বাড়ির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মোস্ট ইন্টারেস্টিং...

চাপা গলায় বললেও, ফেলুদার ঠিক পাশেই থাকায় ওর কথাটা আমি শুনতে পেলাম।

লালমোহনবাবু বললেন, শুধু ইন্টারেস্টিং কেন বলছেন মশাই—আমার কাছে তো ডিস্টাবিং বলেও মনে হচ্ছে। মানে, ঘুড়িটার কথা বলছি না। চারদিকে এত দাড়ি আর জটার মধ্যে মেঘরামের কত স্পাই ঘোরাফেরা করছে ভাবতে পারেন? একটি লোক তো আপনার দিক থেকে চোখ ফেরাচ্ছে না। আমি আড়াচোখে ওয়াচ করে যাচ্ছি। প্রায় তিন মিনিট ধরে।

ফেলুদা আকাশের দিক থেকে চোখ না নামিয়েই বলল, গোঁফ-দাড়ি-জটা-ব্যষ্টি-কমাণ্ডুল, আর গায়ে টাটকা নতুন-কেনা হিন্দি নামাবলী তো?

ফুল মার্কস, বললেন জটায়ু।

আমরা আবার এগিয়ে গেলাম। সামনেই একটা ষাঁড়ের পিছনে একটা সিঁদুর আর জবাফুলে বোঝাই দোকানের পাশে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। ফেলুদা তার সামনে এসে বেশ জোর গলায় বলল, জয় বাবা বিশ্বনাথ! আমার হাসি পেলেও একদম চেপে গেলাম।

বিশ্বনাথ থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম জ্ঞানবাপী। এখানেই আওরঙ্গজেবের মসজিদ, আর এখানেই সেই প্রকাণ্ড খোলা চাতাল। চাতালটায় এসে আবার আকাশের দিকে চাইতে আর ঘুড়িটা দেখতে পেলাম না।

উত্তর দিকে যেখানে চাতালটা শেষ হয়েছে সেখান দিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। রাস্তায়—কারণ চাতালটা রাস্তার চেয়ে প্রায় আট-দশ হাত উঁচুতে। ফেলুদা কী মতলবে বেরিয়েছে সেটা নিয়ে আমার মনে যে সন্দেহটা ছিল, এখন দেখলাম। লালমোহনবাবুও সেই একই সন্দেহ করছেন।

আপনি কি মশাই মেঘরামের বাড়ি যাবার তাল করছেন নাকি?

ফেলুদা বলল, আমার আরাধ্য দেবতা আর কে আছে বলুন। ক্রাইম না থাকলে তো ফেলু মিত্তিরের রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে, সুতরাং এখানকার সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যালের মন্দিরটা একবার দেখে যাব না?

দিনের বেলা চারদিকে শরৎকালের ঝলমলে রোদ আর লোকের ভিড় বলে হয়তো ফেলুদার কথায় অতটা শিউরে উঠলাম না; তবে ওই এক কথায় বুকের ঘড়িটায় দম দেওয়া হয়ে গেছে, আর ধুকপুক শুরু হয়ে গেছে।

এখানে গোলমাল কম, তাই লালমোহনবাবু পরের প্রশ্নটা গলা নামিয়ে করতে পারলেন।

আপনার অস্ত্রটি সঙ্গে নিয়েছেন তো?

কোন অস্ত্রটার কথা বলছেন? রিভলভার নিইনি। বাকি তিনটে সব সময় সঙ্গেই থাকে।

লালমোহনবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফেলুদার দিকে চাইতে গিয়ে একটা হোঁচট খেয়ে কোনওমতে সামলে নিয়ে আর কিছু বললেন না। ভদ্রলোকের বোঝা উচিত ছিল যে ফেলুদার তিনটে স্বাভাবিক অস্ত্র হল ওর মস্তিষ্ক, স্নায়ু আর মাংসপেশী। এর মধ্যে প্রথমটা অবিশ্যি আসল।

সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে সামনেই একটা দরজির দোকান। দোকানের সামনেই বসে একটা লোক পায়ে করে সেলাইয়ের কল চালাচ্ছে। ফেলুদা তাকে জিজ্ঞেস করতেই লোকটা মগনলাল মেঘরাজের বাড়ি বাতলে দিল। রাস্তাটা ধরে পুব দিকে কিছুদূর গেলেই বাঁয়ে একটা মহাবীরের মন্দির পড়বে, তার দুটো বাড়ি পরেই মগনলালের বাড়ি। চেনা সহজ, কারণ সামনের দরজার দু দিকে দুটো সশস্ত্র প্রহরীর ছবি আঁকা রয়েছে।

ছবি ছাড়া এমনি প্রহরী নেই! ফেলুদা প্রশ্ন করল।

হাঁ—তাও আছে।

সোজা রাস্তা, এ-গলি ও-গলি ঘোরার বালাই নেই, তাই মগনলালের বাড়ি পেতে কোনওই অসুবিধা হল না। এখানটায় সত্যি করেই বিশ্বনাথের ঘন্টার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দই পৌঁছায় না। আর দুপুরবেলা বলেই বোধহয় গলিটা এত নিস্তব্ধ। ষাঁড় তো নেই-ই, এমন কী ছাগল কুকুর বেড়াল কিচ্ছু নেই।

মগনলালের বাড়ির দরজার দু দিকে তলোয়ার উচানো প্রহরীর ছবি আছে ঠিকই, কিন্তু জ্যান্ত প্রহরী কাউকে দেখা গেল না। অথচ দরজার পাল্লা দুটোই হাঁ করে খোলা। ব্যাপারটা কী? লোকগুলো খেতে গেল নাকি? ফেলুদা নাক টেনে বলল, খৈনি ঝাড়া হয়েছে। মিনিটখানেক আগেই। তারপর এদিক ওদিক দেখে বলল, আসুন। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বলব নতুন এসেছি, মানমন্দির ভেবে ঢুকেছি।

ফেলুদাকে সামনে রেখে ঢুকে পড়লাম দরজা দিয়ে।

সর্বনাশ–এ কি মগনলালের বাড়ি, না গোয়ালঘর? অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে উঠানে তিনটে জলজ্যান্ত গোরু দাঁড়িয়ে নির্বিকারে জাবর কাটছে, আমাদের দিকে ফিরে দেখবারও কোনও আগ্রহ নেই তাদের। গোরুগুলো যে রাত্রেও এখানেই থাকে তার চিহ্নও চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।

ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, এ ব্যাপারটা এখানে খুব কমন। এই সব গলির বাড়িতে এক উঠন ছাড়া আর খোলা জায়গা বলে কিছু নেই। অথচ দুধ ঘি না হলে এদের চলে না।

আমাদের ডাইনে বাঁয়ে উঁচু বারান্দা দু দিকেই দুটো দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে, দুটোর পিছনেই ঘুরঘুটি অন্ধকার। আন্দাজে মনে হয় ওই অন্ধকারেই দোতলায় যাবার সিঁড়ি। বাড়িটা যে চারতলা সেটা বাইরে থাকতেই দেখেছি। উপর দিকে চাইলে লোহার গারদের মধ্যে দিয়ে খোলা আকাশ দেখা যায়। গরীদের দরকার হয় বাঁদরের উৎপাত থেকে রেহাই পাবার জন্য।

এর পরে কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না, এমন সময় ডান দিকের বারান্দায় চোখ গেল।

একটা লোক নিঃশব্দে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দেখছে। মাঝবয়সী মাঝারি হাইটের লোক, গায়ে সবুজের উপর সাদা বুটি-দেওয়া কুতা, মাথায় কাজ-করা সাদা কাপড়ের টুপি। এক জোড়া পুরু গোঁফ ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে নেমে গালপাট্টা হতে হতে হয়নি।

লোকটা মুখ খুলল। গলার স্বর শুনলে মনে হয় অনেক দিনের পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে কথা বেরোচ্ছে। ফেলুদার দিকে তাকিয়ে লোকটা যে কথাটা বলল সেটা হচ্ছে এই–

শেঠজী আপসে মিলনা চাহতে হেঁ।

কৌন শেঠজী? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

শেঠ মগনলালজী।

চলিয়ে, বলে ফেলুদা লোকটার দিকে পা বাড়াল।

৬. জয় ধাবা বিশ্বনাথ

জয় ধাবা বিশ্বনাথ!

লালমোহনবাবুর মুখের দিকে চাইতে ভরসা পাচ্ছিলাম না, তবে ওর গলার আওয়াজেই ওর মনের ভাবটা বেশ বুঝতে পারলাম।

আপনার এত ভরসা বিশ্বনাথের উপর?

ফেলুদা এখনও কী করে হালকাভাবে কথা বলছে জানি না।

জয় বাবা ফেলুনাথ।

দ্যাট্স বেটার।

এত উঁচু উঁচু পাথরের ধাপওয়ালা এত অন্ধকার সিঁড়ি এর আগে কখনও দেখিনি। যে লোকটা ডাকতে এসেছিল তার হাতে আলোটালো কিছু নেই। লালমোহনবাবুকে বার দু-এক ব্ল্যাক হাল কথাটা বলতে শুনলাম। ছেচল্লিশ ধাপ সিঁড়ি উঠে তিনতলায় পৌঁছলাম আমরা। লোকটা এবার সামনের একটা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। আমরাও ঢুকলাম তার পিছন পিছন।

একটা ঘর, তারপর একটা সরু প্যাসেজ, আর তারপর আরেকটা ঘর পেরিয়ে একটা অন্ধকার বারান্দা দিয়ে বেশ খানিকদূর গিয়ে একটা নিচু দরজা পড়ল। লোকটা এক পাশে

সরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে ফিরে ডান হাত বাড়িয়ে দরজার ভিতর যাবার জন্য ইশারা করল। কথা না বললেও লোকটার মুখ থেকে বিড়ির কড়া গন্ধ পাচ্ছিলাম।

যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা যে কত বড় সেটা তক্ষুনি বোঝা গেল না, কারণ প্রথমে ঢুকে কয়েকটা রঙিন কাচ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। বুঝলাম কাচগুলো জানালায় লাগানো বলে তাতে বাইরের আলো পড়েছে।

নোমোস্কার মিস্টার মিটার।

খসখসে সুগভীর দানাদার গলাটা আমাদের সামনে থেকেই এসেছে। এবারে চোখ অন্ধকারে সয়ে এসেছে। একটা সাদা গদি দেখতে পাচ্ছি—আমাদের সামনে কিছুটা দূরে মেঝেতে বিছানো রয়েছে। তার উপরে চারটে সাদা তাকিয়া। একটায় ভর দিয়ে আড় হয়ে বসে আছে একটা লোক, যার শুধু পিছন দিকটা আমরা সেদিন দেখেছি। মছলিবাবার ভক্তদের মধ্যে।

একটা খুটি শব্দের সঙ্গে সিলিং-এ একটা বাতি জ্বলে উঠল। পিতলের বলের গায়ে ফুটা ফুটা জফ্রির কাজ-সেটা হল বাতিটার শেড। ঘরের চারদিক এখন বুটিদার আলোর নকশায় ভরে গেছে।

এখন সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। মগনলাল মেঘরাজের ভুরুর নীচে গর্তে বসা চোখ, তার নীচে ছোট্ট থ্যাবড়া নাক, আর তার নীচে এক জোড়া ঠোঁট, যার উপরেরটা পাতলা আর নীচেরটা পুরু। ঠোঁটের নীচে থুতনিটা সোজা নেমে এসেছে একেবারে আদ্দির পাঞ্জাবির গলা অবধি। পাঞ্জাবির বোতামগুলো হিরের হলে আশ্চর্য হব না। এ ছাড়া ঝলমলে পাথর আছে দশটা আঙুলের আটটা আংটিতে, যেগুলো এখন নমস্কারের ভঙ্গিতে এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে। r

বোসুন আপনারা। দাঁড়িয়ে কেনো?

দিব্যি বাংলা।

চাই তো গদিতে বসুন। আর নয়তো চেয়ার আছে। যাতে ইচ্ছা বসুন।

চেয়ারগুলো নিচু। পরে ফেলুদা বলেছিল। ওগুলো নাকি গুজরাটের। আমরা গদিতে না বসে চেয়ারেই বসলাম-ফেলুদা একটাতে আর আমি আর লালমোহনবাবু আরেকটাতে।

মগনলাল সেইভাবেই কত হয়ে থেকে বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা ছিল, ভাবছিলাম আপনাকে ইনভাইট করে নিয়ে আসব। ভগওয়ানের কৃপায় আপনি নিজেই এসে গেলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, আপনি আমাকে চিনেন না, কিন্তু হামি আপনাকে চিনি।

আপনার নামও আমি শুনেছি, ফেলুদা পালটা ভদ্রতা করে বলল।

নাম বলছেন কেন, বদনাম বলুন। সত্যি কথা বলুন!

মগনলাল কথাটা বলে হা হা করে হেসে উঠলেন, আর তার ফলে তাঁর পানখাওয়া দাঁতগুলোতে আলো পড়ে চকচক করে উঠল। ফেলুদা চুপ করে রইল। মগনলালের মাথাটা আমার দিকে ঘুরে গেল।

ইনি আপনার ব্রাদার?

কাজিন।

আর ইনি? আঙ্কল?

মগনলালের চোখে হাসি, চোখ ঘুরে গেছে জটায়ুর দিকে।

ইনি আমার বন্ধু। লালমোহন গাঙ্গুলী।

ভেরি গুড। লালমোহন, মোহনলাল, মগনলাল-সব লাল, লালে। লাল-এঁ? কী বলেন?

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকে হাঁটু নাচিয়ে আমি একটুও নাভার্স হইনি, ভাব দেখানার চেষ্টা করছিলেন, এবার মগনলালের কথাটা শুনেই হাঁটু দুটো খট খট শব্দ করে পরস্পরের সঙ্গে লাগিয়ে নাচানো বন্ধ হয়ে গেল।

এবার মগনলালের বাঁ হাতটা একটা থাপ্পড়ের ভঙ্গিতে তাকিয়ার পিছনে নামাতেই ঠং করে একটা কলিং বেল বেজে উঠে। লালমোহনবাবুকে বিষম খাইয়ে দিল।

গলা সুখিয়ে গেলো? বললেন মগনলাল।

বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি যো-লোকটা আমাদের উপরে নিয়ে এসেছিল সে আবার দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

সরবত লাও, হুকুম করলেন মগনলাল।

এখন ঘরের সব জিনিসই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মগনলালের পিছনের দেওয়ালে দেবদেবীর ছবির গ্যালারি। ডান দিকে দেওয়ালের সামনে দুটো স্টিলের আলমারি। গদির উপরে কিছু খাতপত্র, একটা বোধহয় ক্যাশবাক্স, একটা লাল রঙের টেলিফোন, একটা হিন্দি খবরের কাগজ! এ ছাড়া তাকিয়ার ঠিক পাশেই রয়েছে একটা রুপের পানের ডিবে। আর একটা রুপোর পিকদান।

ওয়েল মিস্টার মিত্তির—মগনলালের স্থির দৃষ্টিতে আর হাসির নামগন্ধ নেই—আপনি বনারস হলিডের জন্যে এসেছেন?

সেটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল।

ফেলুদা সটান মগনলালের চোখের দিকে চেয়ে কথা বলছে।

তা হলো–আপনি–টাইম–ওয়েস্ট–করছেন–কেন?

প্রত্যেকটা কথা ফাঁক ফাঁক আর স্পষ্ট করে বলা।

সারনাথ দেখেছেন? রামনগর দেখেছেন? দুর্গাবাড়ি, মানমন্দির, হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বেণীমাধোব ধ্বজ-এ-সব কিছুই দেখলেন না, আজ বিশ্বনাথজীর দরওয়াজার সামনে গেলেন, কিন্তু ভিতরে ঢুকলেন না, কচৌরি গলিতে মিঠাই খেলেন না...ঘোষালবাড়িতে কী কাম আপনার? আমার বজরা আছে আপনি জানেন? চৈতি ঘটসে অসসি ঘাট টিরিপ দিয়ে দেবো আপনাকে, আপনি চলে আসুন। গঙ্গার হাওয়া খেয়ে আপনার মনমেজাজ খুশী হয়ে যাবে।

আপনি ভুলে যাচ্ছেন-ফেলুদার গলা এখনও স্থির, যাকে বলে নিষ্কম্প-যে আমি একজন পেশাদারি গোয়েন্দা। মিস্টার ঘোষাল আমাকে একটা কাজের ভার দিয়েছেন। সে কাজটা শেষ না করে ফুর্তি করার কোনও প্রশ্ন আসে না।

কতো আপনার ফ্রি?

ফেলুদা প্রশ্নটা শুনে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর বলল, দ্যাট ডিপেন্ডস–

এই নিন।

তাজ্জব, দম-বন্ধ-করা ব্যাপার। মগনলাল ক্যাশবাক্স খুলে তার থেকে একতাড়া একশো টাকার নোট বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

ফেলুদার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

বিনা পরিশ্রমে আমি পারিশ্রমিক নিই না মিস্টার মেঘরাজ।

বাহরে বাঃ!-মগনলালোব্রা পান-খাওয়া দাঁত আবার বেরিয়ে গেছে-আপনি পরিশ্রম করে কী করবেন? যেখানে চোরিই হল না, সেখানে আপনি চোর। পাকড়বেন কী করে মিস্টার মিত্তির?

চুরি হল না মানে?—এবারে ফেলুদাও অবাক—কোথায় গেল সে জিনিস?

সে জিনিস তো উমানাথ আমার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তিস হাজার ক্যাশ দিয়ে আমি সে জিনিস কিনে নিয়েছি।

কী বলছেন। আপনি উলটো-পালটা?

ফেলুদার বেপরোয় কথায় আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সিলিং-এর বাতিটা থেকে একটা আলোর নকশা। লালমোহনবাবুর নাক আর ঠোঁটের উপর পড়েছে। বেশ বুঝলাম ওঁর ঠোঁট শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

মগনলাল ওর শেষ কথাটা বলে হেসে উঠেছিল, ফেলুদা কথাটা বলতেই মনে হল একটা হাসির রেকর্ডের উপর থেকে কে যেন সাউন্ড-বক্সটা হঠাৎ তুলে নিল। মগনলালের মুখ এখন কালবৈশাখীর মেঘের মতো কালো, আর চোখ দুটো যেন কোিটর থেকে বেরিয়ে এসে বুলেটের মতো ফেলুদাকে বিঁধতে চাইছে।

উলটা-পালটা কে বলে জানেন? উলটা-পালটা বলে উলটো-পালটা আদমি। মগনলাল বলে না। উমানাথের বেপার কী জানেন। আপনি? তার বেওসার বিষয় কিছু জানেন? উমানাথের দেনা কত জানেন? উমা নিজে আমাকে ডেকে পাঠাল জানেন? উমা নিজে সিন্দুক থেকে গণপতি চারি করেছে জানেন? আপনি চোর কী ধরবেন মিস্টার মিত্তির-চোর তো আপনার মক্কেল নিজে!

ফেলুদা গভীর গলায় বলল, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন সেটা পরিষ্কার হচ্ছে না মগনলালজী। নিজের জিনিস চুরি করবার দরকারটা কোথায়? সোজা সিন্দুক থেকে বার করে আপনার হাতে তুলে দিয়ে টাকাটা নিয়ে নিলেই তো হত।

কার সিন্দুক? সিন্দুক তো ওর বাবার।

কিন্তু গণেশটা তো—

গণেশ-কার? ঘোষাল ফ্যামিলির। ফ্যামিলি তিন জায়গায় ভাগ হয়ে গেছে। বড় ছেলে বিলাইতে ডাকটর-ছোট ছেলে উমানাথ কলকাতায় কেমিক্যালস-আর বাবা বেনারসের উকিল-এখুন প্র্যাক্টিস ছেড়ে দিয়েছেন। গণপতি ছিল অল অ্যালং বাবার কাছে। গণপতির ইনফ্লুয়েন্স দেখবেন তো ওনাকে দেখুন। কতো টাকা কামায়েছেন দেখুন, মেজাজ দেখুন, আরাম দেখুন। তার সিন্দুক থেকে গণেশ বার করে উমানাথ আমাকে বিক্রি করল–সে কথা সে বাপকে জানাবে কী করে? তার সাহস কোথায়?

ফেলুদা ভাবছে। সে কি মগনলালের কথা বিশ্বাস করছে?

সিন্দুক থেকে কবে গণেশ নিলেন উমানাথবাবু?

মগনলাল তাকিয়াটা আরও বুকের কাছে টেনে নিল।

শুনুন–অক্টোবর দশ তারিখ আমাকে ডেকে পাঠাল উমা। সেদিন কথা হল। আমি এগ্রি করলাম। আমার লাফ ভি কুছু খারাপ যাচ্ছে-আপনি হয়তো জানেন। লেকিন আমার টাকার অভাব এখুনো হয়নি। আর উ গ্রিন ডায়মন্ডকে কত দাম জানেন? উমা জানে না! আমি যা পেশ করলাম। তার চেয়ে অনেক বেশি। এনিওয়ে-দশ অক্টোবর কথা হল। উমা বলল আমাকে দো-তিন দিন টাইম দাও। আমি বললাম নাও! ফিফটিনর্থ অক্টোবর ইভনিং উমা আবার ফোন করল। বলল। গণেশ আমার হাথে এসে গেছে। আমি বললাম। তুমি চলে এসো মছলিবাবা দর্শন করতে। উমা এসে গেল! আমি এসে গেলাম। আমার হাথে ব্যাগ, উর। পাকিটে ব্যাগ। উর ব্যাগে গণপতি, আমার ব্যাগে তিন-সিও হাভূড রুপি নোটস। দর্শন ভি হল, ব্যাগ বদল ভি হল। ব্যস, খতম।

মগনলাল যদি সত্যি কথা বলে থাকে, তা হলে বলতে হবে উমানাথবাবু আমাদের সাংঘাতিক ভাঁওতা দিয়েছেন আর নিজের মান বাঁচানার জন্য একটা চুরির গল্প খাড়া করে ফেলুদাকে তদন্ত চালাতে বলেছেন। অবশ্যি সেই সঙ্গে পুলিশকেও ভাঁওতা

দিয়েছেন। পুরো ব্যাপারটাই ফেলুদার পক্ষে পণ্ডশ্রম হবে, আর পকেটে পয়সাও আসবে না। কিন্তু মগনলালই বা ফেলুদার প্রতি এত সদয় হবে কেন?

আমি প্রায় চমকে উঠলাম যখন ফেলুদা ঠিক এই প্রশ্নটাই মগনলালকে করে বসল। মগনলাল তার চোখ দুটোকে আরও ছোট করে একটু সোজা হয়ে বসে বলল, কারণ আমি জানি আপনি বুদ্ধিমান লোক। অর্ডিনারি বুদ্ধি না, একস্ট্রা-অর্ডিনারি বুদ্ধি। আপনি আরও কিছুদিন তদন্ত করলে যদি আসল বেপারটা বুঝে ফেলেন, তখন উমরাও মুশকিল, আমারও মুশকিল। আমাদের এই লেনদেনের বেপারটা তো ঠিক সিধা-সাফা নয়-সে তো আপনি বুঝেন মিস্টার মিত্তির।

ফেলুদা চুপ করে আছে। তিন গেলাস সবুজ রঙের সরবত এসেছে—আমাদের সামনে টেবিলের উপর রাখা। ফেলুদা একটা গেলাস হাতে তুলে নিয়ে বলল, গণেশটা তা হলে আপনার কাছেই আছে। সেটা একবার দেখা যায় কি? যেটার সঙ্গে এত রকম ইতিহাস জড়িত, সেটা একবার দেখতে ইচ্ছা হওয়াটা স্বাভাবিক এটা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

মগনলাল মাথা নেড়ে বললেন, ভেরি সরি মিস্টার মিত্তির, আপনি তো জানেন আমার এ বাড়িতে একবার রেড হয়ে গেছে। ও জিনিস কী করে আমি এখানে রাখি বলুন। ওটা আমাকে একটা সেফ জায়গায় পাঠিয়ে দিতে হয়েছে।

ফেলুদার পরের কথাতে ওর বেপরোয়া ভাবটা আমার কাছে আবার নতুন করে ফুটে বেরোল।

তা পাঠিয়েছেন বেশ করেছেন, কিন্তু আপনি সত্যি বলছেন কি না জানার জন্যও তো আমাকে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে মগনলালজী।—তাতে যদি আপনার কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হয় তা হলে তো কথাই নেই, কিন্তু ধরুন যদি তা না হয়?

মগনলালের তলার ঠোঁটটা বিশ্রীভাবে নীচের দিকে ঝুলে পড়ল, আর তার ভুরুজোড়া আরও নেমে এসে চোখ দুটোকে অন্ধকারে ঠেলে দিল।

আপনি আমার কথা বিসোয়াস করছেন না?

লালমোহনবাবু সরবতের গেলাসটা তুলেই আবার ঠিক করে নামিয়ে রাখলেন। ফেলুদার হাতের গেলাস আস্তে আস্তে ঠোঁটের কাছে চলে গেল। সরবতে একটা চুমুক দিয়ে একদৃষ্টি মগনলালের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি নিজেই বললেন আপনাকে আমি চিনি, না। কী করে আশা করেন প্রথম আলাপেই আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করব? আপনি নিজেই কি সব সময় নতুন লোকের কথা বিশ্বাস করেন–বিশেষ করে যখন সে লোক দিনকে রাত করে দেয়?

মগনলাল সেইভাবেই চেয়ে আছে ফেলুদার দিকে। একটা ঘড়ির টিক্ টক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি, যদিও সেটা কোথায় আছে তা জানি না।

এবার মগনলালের ডান হাতটা আবার ফেলুদার দিকে এগিয়ে এল—ততে এখনও সেই নোটের তাড়া।

তিন হাজার আছে। এখানে মিস্টার মিত্তির। আপনি নিন এ টাকা। নিয়ে আপনি বিশ্রাম করুন, স্ফুর্তি করুন আপনার কাজিন আর আঙ্কলকে নিয়ে।

না মগনলালজী, ওভাবে আমি টাকা নিই না।

আপনি কাজ চালিয়ে যাবেন?

যেতেই হবে।

ভেরি গুড।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মগনলালের হাত আবার কলিং বেলের উপর আছড়ে পড়ল। সেই লোকটা আবার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মগনলাল লোকটার দিকে না তাকিয়ে বলল, অর্জ্জুনকো বোলাও-আউর তেরা নম্বর বুকস লাও-আউর তক্তা।

লোকটা চলে গেল! কী যে আনতে গেল তা ভগবান জানে।

মগনলাল এবার হাসি হাসি মুখ করে লালমোহনবাবুর দিকে চাইলেন। লালমোহনবাবুর ডান হাত এখনও সরবতের গেলাসটাকে ধরে আছে, যদিও সে গেলাস টেবিল থেকে এক ইঞ্চিও-ওঠেনি।

কেয়া মোহনভোগবাবু, আমার সরবত পসিন্দ হল না?

না না-বৎসর-ইয়ে, সরবত-মানে... আরও বললে আরও কথার গণ্ডগোল হয়ে যাবে। মনে করেই বোধহয় লালমোহনবাবু গেলাসটা তুলে ঢাক ঢক করে দু ঢোক সরবত খেয়ে ফেললেন।

আপনি ঘাবড়াবেন না মোহনবাবু-উ সরবতে বিষ নেই।

না না–

বিষ আমি খারাপ জিনিস বলে মনে করি।

নিশ্চয়ই–বিষ ইজ-আরেক ঢোক সরবত–ভেরি ব্যাড।

তার চেয়ে অন্য জিনিসে কাম দেয় বেশি।

অন্য জিনিস?

কী জিনিস সেটা এবার আপনাকে দেখাব।

খ্যাখ্!

কী হল মোহনভোগবাবু?

বিষ–মানে বিষম লাগল।

বাইরে পায়ের শব্দ।

একটা অদ্ভুত প্রাণী এসে ঘরে ঢুকল। সেটা মানুষ তো বটেই, কিন্তু এরকম মানুষ আমি কখনও দেখিনি। হাইটে পাঁচ ফুটের বেশি না, রোগী লিকলিকে শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিরা-উপশিরায় গিজগিজ করছে, মাথার চুলে কদম ছাঁট, কান দুটো খাড়া হয়ে বেরিয়ে আছে, চোখ দুটো দেখলে মনে হয় নেপালি, কিন্তু নিকটা খাঁড়ার মতো উঁচু আর খুঁচোলো। আরও একটা লক্ষ করার বিষয় এই যে, লোকটার সারা গায়ে একটাও লোমা নেই। হাত পা আর বুকের অনেকখানি এমনিতেই দেখা যাচ্ছে, কারণ লোকটা পরেছে একটা শতচ্ছিন্ন হাতকটা গেঞ্জি আর একটা বেগুনি রঙের ময়লা হাফ প্যান্ট।

লোকটা ঘরে ঢুকেই মগনলালের দিকে ফিরে একটা স্যালুট করল। তারপর হাতটা পাশে নামিয়ে কোমরটাকে একটু ভাঁজ করে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার ঘরে আরেকটা জিনিস ঢুকল। এটাই বোধহয় তেরো নম্বর বাক্স; দুটো লোক বাক্সটা বয়ে এনে গদির সামনে মেঝেতে রাখল। রাখার সময় একটা ঝনৎ শব্দে বুঝলাম ভিতরে লোহা বা পিতলের জিনিসপত্র আছে।

আরও দুটো লোক এবার একটা বেশ বড় কাঠের তক্তা নিয়ে এসে আমাদের পিছনের দরজাটা বন্ধ করে তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। এতক্ষণে মগনলাল আবার মুখ খুললেন।

নাইফ-থ্রোইং জানেন কী জিনিস মিস্টার মিত্তির? সাকাসে দেখেছেন কখনও?

দেখেছি।

সার্কাস আমি দেখেছি, কিন্তু নাইফ-থ্রোইং দেখিনি। ও-ই একবার বলেছিল ব্যাপারটা কীরকম হয়। একজন লোককে একটা খাড়া করা তক্তার সামনে দাঁড় করিয়ে দূর থেকে আরেকটা লোক তার দিকে একটার পর একটা ছোরা এমনভাবে মারতে থাকে যে, সেগুলো লোকটার গায়ে না লেগে তাকে ইঞ্চিখানেক বাঁচিয়ে তক্তার উপর গিয়ে বিঁধতে থাকে। সে নাকি এমন সাংঘাতিক খেলা যে দেখে লোম খাড়া হয়ে যায়। সেই খেলাই আজ দেখাবে নাকি এই অর্জ্জুন?

তেরো নম্বর বাক্স খোলা হয়েছে। ঘরে আরও দুটো বাতি জ্বলে উঠল। বাক্সে বোঝাই করা কেবল ছোরা আর ছোরা। সেগুলো সবকটা ঠিক একরকম দেখতে-সব কাঁটার হাতির দাঁতের হাতল, সব কটায় ঠিক একরকম নকশা করা।

হরবনসপুরের রাজার প্রাইভেট সার্কাস ছিল, সেই সাকাসেই অর্জ্জুন নাইফ থ্রোইং-এর খেল দেখাত। এখুন ও হামার প্রাইভেট সাকাসে খেল দেখায়-হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ...

বাক্স থেকে গুনে গুনে বারোটা ছোরা বার করে আমাদের সামনেই একটা শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে একটা খোলা জাপানি হাতপাখার মতো করে।

আসুন আঙ্কল।

আঙ্কল কথাটা শুনে লালমোহনবাবু তিনটে জিনিস একসঙ্গে করে ফেললেন—হাতের ঝাটকায় গেলাসের অর্ধেক সরবত মাটিতে ফেললেন, পেটে ঘুষি খাবার মতো করে সোজা থেকে সামনের দিকে ঝুকে গেলেন, আর অ্যাঁ বলতে গিয়ে গ্যাঁ বলে ফেললেন। পরে জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলেন উনি নাকি অ্যাঁ আর গেলুম একসঙ্গে বলতে গিয়ে গ্যাঁ বলেছিলেন।

এবার ফেলুদার ইস্পাত-কঠিন গলার স্বর শোনা গেল।

ওকে ডাকছেন কেন?

মগনলালের হাসির চাটে তার কনুই আরও ইঞ্চি তিনেক তাকিয়ার ভিতর ঢুকে গেল।

ওকে ডাকব না তা কি আপনাকে ডাকব মিস্টার মিত্তির? আপনি তক্তার সামনে দাঁড়ালে খেল দেখবেন কী করে?...আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না মিস্টার মিত্তির। আমার কথা বিসেয়াস না করে আপনি আমাকে অনেক অপমান করলেন। আপনি জানবেন। যে চাকু ছাড়াও অন্য হাতিয়ার আছে আমার কাছে। ওই ঘুলঘুলির দিকে দেখুন—দো ঘুলঘুলি, দো পিস্তল আপনার দিকে পয়েন্ট করা আছে। আপনি ঝামেলা না করেন তো আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। আপনার বন্ধুর ভি কোনও ক্ষতি হবে না। অর্জনের জবাব নেই, আপনি দেখে নেবেন।

ঘুলঘুলির দিকে চাইবার সাহস আমার নেই। লালমোহনবাবুর দিকেও চাইতে ইচ্ছা! করছিল না, কিন্তু চাপা মিহি গলায় ওর একটা কথা শুনে না চেয়ে পারলাম না। ভদ্রলোক হাতল ধরে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে কথাটা বলছেন, তার ফাঁকে ফাঁকে ওঁর হাঁটুতে হাঁটু লেগে খটখটি শব্দ হচ্ছে।

বেঁচে থাকলে... পপ-প্লটের আর...চি-হি-হিন্তা নেই।

দুজন লোক এসে লালমোহনবাবুকে দু দিক থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে তক্তগটার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। লালমোহনবাবু চোখ বুজলেন।

তারপর আমার পিছন দিকে যে জিনিসটা ঘটল সেটা আর আমি দেখতে পারিনি। ফেলুদা নিশ্চয়ই দেখেছিল, কারণ না দেখলে নিশ্চয়ই ঘুলঘুলি থেকে পিস্তলের গুলি এসে ওর বুকে বিধত। আমার শব্দ শুনেই রক্ত বরফ হয়ে গিয়েছিল। আমার চোখ ছিল সামনের টেবিলের দিকে। তার উপর থেকে একটা একটা করে ছুরি তুলে নিচ্ছে অর্জুনের হাত, আর। তার পরেই সে ছুরি ঘাঁচাং শব্দ করে তক্তার কাঠ ভেদ করে ঢুকছে।

ক্রমে শেষ ছুরিটা তোলা হয়ে গিয়ে টেবিল খালি হয়ে গেল, আর ঘ্যাঁচাং শব্দ, আর অর্জ্জুনের ফোঁস ফোঁস করে দম ফেলার শব্দ, আর মগনলালের ঘন ঘন বহুৎ আচ্ছা থেমে

গিয়ে রইল শুধু অদৃশ্য ঘড়ির টিক টিক আর বিশ্বনাথের ঘণ্টার ঢং ঢেং শব্দ। আর তার পরে হল এক তাজ্জব কাণ্ড।

লালমোহনবাবু দরজার দিক থেকে ফিরে এসে অর্জুনের হ্যান্ড শেক করে থ্যাঙ্ক ইউ স্যার বলেই অজ্ঞান হয়ে হুমড়ি খেয়ে মগনলালের গদির উপর পড়ে সেটার অনেকখানি জায়গা ঘামে ভিজিয়ে চপচাপে করে দিলেন।

৭. দশাশ্বমেধ ঘাট

দুটো বাজে। আকাশে মেঘ। দশাশ্বমেধ ঘাটে এখন লোক নেই বললেই চলে। আমরা তিনজন জলের ধারে বসে আছি। ঘাটের সিঁড়ির উপর। মগনলালের ঘরে বিভীষিকাময় ঘটনাটার পর প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেছে। মগনলালের লোকই লালমোহনবাবুর জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিল চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে। তারপর মগনলাল নিজে দুধের সঙ্গে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে খাইয়ে লালমোহনবাবুকে চাঙ্গা করে বলেছিল, আঙ্কল, ইউ আর এ ব্রেভ ম্যান। তারপর থেকে লালমোহনবাবু কথাটথা আর বিশেষ বলছেন না, কেবল ফেলুদাকে একবার জিজ্ঞেস করেছেন তার মাথার চুল সব পেকে গিয়েছে কি না। তাতে আমরা দুজনেই তাকে আশ্বাস দিয়েছি যে নতুন করে একটি চুলও পাকেনি।

মগনলালের হাবভাবে স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে ফেলুদা তদন্ত চালাতে গেলেই সে খতম। হয়ে যাবে।–হয় ছুরিতে, না হয় গুলিতে। অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত ফেলুদা একটা কনসেশন আদায় করে নিয়েছে; সে আরও একটিবার ঘোষালবাড়িতে যাবে, কারণ হঠাৎ ডুব মেরে গেলে সেটা তার সম্মানের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর হবে। যাওয়ার ব্যাপারে দেরি করে লাভ নেই, কাজেই সেটা আজই বিকেলে সেরে ফেলতে হবে। মগনলাল আমাদের বিদায় দেবার আগে স্পষ্ট কথায় শাসিয়ে দিয়েছে–আপনি জেনে রাখবেন মিস্টার মিত্তির যে, আপনি বাড়াবাড়ি যা করবেন তা অ্যাট ইওর ওন রিসক। আর আপনার উপর নজর রাখার কেওস্তু আমার আছে সেটাও আপনি জানবেন।

এটা বলতে খারাপ লাগছে যে এখন পর্যন্ত মগনলালই ফেলুদার উপর টেক্কা মেরে আছে। এটা আমি জানি যে যতই ডাকসাইটে প্রতিদ্বন্দ্বী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই ফেলুদার জয় হয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে মগনলাল মেঘরাজের মতো সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে এর আগে ফেলুদাকে কখনও পড়তে হয়নি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে গঙ্গার দিকে চেয়ে থেকে ফেলুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, গণেশটা ঘোষালবাড়িতে রয়ে গেছে রে-তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নইলে লোকটা আমাকে তদন্ত বন্ধ করার জন্য এতগুলো টাকা অফার করে না; কিন্তু কথা হচ্ছে-সেটা কোথায়? সেটা কেন এখনও পর্যন্ত মগনলালের নাগালের বাইরে? কখন কীভাবে সেটা সে হাত করার কথা ভাবছে? আর সব শেষে আরও দুটো প্রশ্ন—কে সেটা সিন্দুক থেকে সরাল, এবং ও বাড়ির কার সঙ্গে মগনলালের যোগসাজশ রয়েছে?

ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে মিনিট পাঁচেক উলট-পালটে দেখল। বুঝতে পারছি ইতিমধ্যে সেটাতে বেশ কিছু নতুন জিনিস লেখা হয়েছে, কিন্তু সেটা যে কী তা এখনও জানি না। লালমোহনবাবুকে লক্ষ করছি মাঝে মাঝে শিউরে উঠছেন, আর নিজের শরীরের এখানে ওখানে হাত বুলিয়ে দেখছেন। তিনি যে অক্ষত আছেন সেটা বোধহয় এখনও ওঁর বিশ্বাস হচ্ছে না।

আমরা যখন ঘাট থেকে উঠলাম তখনও আকাশ ছাই রঙের মেঘের টুকরোতে ছেয়ে আছে। আকাশটা দেখতে গিয়েই লাল-সাদা পেটকাটি ঘুড়িটার দিকে চোখ গেল। ফেলুদাও দেখেছে, কারণ ওর সিঁড়ি-ওঠা থেমে গেল।

ঘুড়িটা উড়ছে যে বাড়িটার মাথার উপর সেটা আমাদের চেনা বাড়ি। এটা সেই লালবাড়ি-যার ছাতে শয়তান সিংকে ক্যাপ্টেন স্পার্কের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। বাড়ির ছাতে কে? শয়তান সিং না? হ্যাঁ-কোনও সন্দেহ নেই। এ হল রুকুর বন্ধু সূর্য। সে এক দৃষ্টিতে আকাশের ঘুড়িটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

এবার ঘুড়িটা গোঁৎ খেয়ে সূতোর টানে নীচের দিকে নেমে এল। সূরায্যের ডান হাতটা একটা ঝটিকা দিয়ে উপর দিকে উঠল। তার ফলে একটা ঢিল। শূন্যে উঠে ঘুড়িটার পিছন দিকে চলে গেল।

এবার বুঝলাম ঢিলটা একটা সুতোর সঙ্গে বাঁধা, আর সুতোটা ধরা সূরযের হাতে।

সেই সুতো ধরে সূর্য টান দিচ্ছে, আর তার ফলে বন্দি ঘুড়িটা তার হাতে চলে আসছে।

গোধূলিয়ার মোড়ে একটা দোকানে বসে চা খেয়ে আমরা যখন শংকরী নিবাসে পৌঁছলাম তখন প্রায় চারটে বাজে। ত্রিলোচন পাণ্ডে সেলাম ঠুকে ফটক খুলে দিল। আমরা গাড়িবারান্দায় পৌঁছানোর আগেই সকলেরই মতো বিকাশবাবু বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

কী খবর? এনি প্রোগ্রেস?

উঁহু, ফেলুদা বলল।শহর দেখে বেড়ালাম সারা দিন।

ওঁরা তো সব বেরিয়েছেন।

উমানাথবাবুর গাড়িটা দেখছিলাম না। তা ছাড়া বাড়িটা দেখেও কেমন জানি খালি খালি মনে হচ্ছিল।

কোথায় গেছেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

সারনাথ। আজও কিছু আত্মীয়স্বজন এসেছেন বাইরে থেকে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুটো গাড়ি বোঝাই করে বেরিয়েছেন সব, ফিরতে সন্ধে হবে।

রুকুও গেছে?

না। রুকুর সারনাথ দেখা হয়ে গেছে। ও গেছে টারজান দেখতে ওর এক মামার সঙ্গে।

আসবার সময় রাস্তার দেওয়ালে বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে। সেই আদ্যিকালের ছবি-আমার জন্মের আগে, ফেলুদার জন্মের আগে, এমন কী লালমোহনবাবুর জন্মের আগে-টারজন দি এপ ম্যান।

আমার ঘরে এসে বসবেন একটু? বিকাশবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, আগে একবার ছাদে যাব।—যদি সম্ভব হয়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ-আপনার জন্য এ বাড়ির সব দরজা খোলা।

সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেই চণ্ডীপাঠের আওয়াজ পেলাম। সেটা পুজোমণ্ডপ থেকে আসছে জানি, কিন্তু এত জোরে আওয়াজ তো কাল পাইনি। ডান দিকে চাইতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সিঁড়ির পিছনের দরজাটা আজ খোলা, আর সেটা দিয়ে দিব্যি পুজোর জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। আমরা চারজনেই দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে শশীবাবু এক মনে তুলি চালিয়ে যাচ্ছেন।

কালই তো শশীবাবুর কাজ শেষ, বলল ফেলুদা।

হ্যাঁ, বললেন বিকাশবাবু, ভদ্রলোকের জ্বর এখনও সম্পূর্ণ সারেনি, তাও একনাগাড়ে তুলি চালিয়ে যাচ্ছেন।

ছাদ দেখা মানে যে আসলে রুকুর ঘর দেখা সেটা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। সেদিন সকালে এ ঘরে রোদ ছিল না, আজ পশ্চিমের জানালা দিয়ে ঝলমলে রোদ এসে চারিদিকের ছড়ানো জিনিসের উপর পড়েছে।

আমি ভেবেছিলাম আজ যখন রুকু নেই তখন ফেলুদা হয়তো তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালাবে, কিন্তু তার পরেই মনে হল মগনলালের হুমকির কথা। বেশিক্ষণ শংকরী নিবাসে

থাকাটাই ফেলুদার পক্ষে বিপজ্জনক। তা ছাড়া বেশি অনুসন্ধানের দরকার হল না, কারণ ফেলুদা যেটা খুঁজছিল সেটা ঘরে ঢুকেই পেয়ে গেল।

আজই বিকেলে সূরায্যের ফাঁসে বন্দি হতে দেখেছি। এই লাল-সাদা পেটকাটিটাকে। মেঝের উপর লাটাই চাপা অবস্থায় পড়ে আছে ঘুড়িটা; সেটার উপর যে উৎপাত হয়েছে। সেটা দেখলেই বোঝা যায়; কাল আর এ ঘুড়ি আকাশে উড়বে না।

ফেলুদা লাটাইটা তুলতেই একটা জিনিস চোখে পড়ল।

ঘুড়ির সাদা অংশটাতে নীল পেনসিল দিয়ে হিন্দি অক্ষরে কী যেন লেখা রয়েছে। দুটো জায়গায় আলাদা করে লেখা!

কাছ থেকে পড়ে বুঝতে পারলাম ভাষাটা বাংলা। বোধহয় সূরয বাংলা পড়তে পারে না বলেই রুকুকে এটা করতে হয়েছে।

একটা লেখা হল এই–

আমি বন্দি। সব ঠিক আছে। হা হা। আবার বিকেলে। ইতি ক্যাপ্টেন স্পার্ক।

অন্যটা হল–

টারজন দেখতে যাচ্ছি। আবার কাল সকালে। ইতি ক্যাপ্টেন স্পার্ক।

বাপরে বাপ। বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। কোন জগতে বাস করে মশাই এ ছেলে?

ফেলুদা ঘুড়িটাকে আবার ঠিক যেইভাবে ছিল সেইভাবে রেখে বলল, রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের জগৎ। শিশুমনের উপর আপনাদের বইয়ের কী প্রভাব তার স্পষ্ট নিদর্শন এটা।

আমরা রুকুর ঘর থেকে নীচে ফিরে এলাম। বিকাশবাবু চায়ের কথা আগেই বলে। দিয়েছিলেন, তার ঘরে গিয়ে বসতেই ভরদ্বাজ ট্রে নিয়ে ঢুকল।

ঘরটা বেশ বড়। একদিকে খাট, অন্যদিকে একটা কাজের টেবিলের সামনে একটা চেয়ার। এ ছাড়াও বসবার জন্য একটা সোফা রয়েছে। ফেলুদা টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসল, আমরা দুজন সোফাতে, আর বিকাশবাবু খাটে। পাশের বৈঠকখানায় ঘড়িতে মোলায়েম সুরে ঢং ঢেং করে চারটে বাজল; শুনলেই বোঝা যায় জাত ঘড়ি।মিস্টার ঘোষালের কেমিক্যালের ব্যবসা কীরকম চলে? ফেলুদা প্রশ্ন করল। ভালই তো। বিকাশবাবু যদি প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে থাকেন তো সেটা তার কথায় কিছু বোঝা গেল না–অবিশ্যি মাঝে-মধ্যে যে স্ট্রাইক ইত্যাদি হয় না তা নয়। তা সে কোন ব্যবসায় হয় না বলুন!

হুঁ...

ফেলুদা হঠাৎ হাতের কাপটা রেখে উঠে পড়ে বলল, একবার বৈঠকখানাটা দেখতে পারি?

নিশ্চয়ই।

আমরা চারজনই চা খাওয়া বন্ধ রেখে বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম। বিকাশবাবুর ঘর থেকে বৈঠকখানায় যাবার কোনও দরজা নেই; যেতে হলে আগে একটা বারান্দা পড়ে।

সেদিন মগনলাল আর উমানাথবাবু কোথায় বসেছিলেন সেটা জানতে পারি?

বিকাশবাবু দুটো মুখোমুখি সোফা দেখিয়ে দিলেন।

ওদিকে কি ঘর? না আরেকটা বারান্দা?

আমরা যে বারান্দা দিয়ে ঢুকলাম সেটা পূব দিকে; ফেলুদা দক্ষিণ দিকের দুটো পদর্থ দেওয়া দরজার দিকে দেখিয়ে প্রশ্নটা করল।

ওদিকে দুটো দরজার পিছনে দুটো ঘর। একটা বড় কর্তাঁর আপিস ঘর ছিল; অন্যটায় মক্কেলেরা অপেক্ষা করত।

আমরা দুটো ঘরের ভিতরেই ঢুকে মিনিটখানেক করে থেকে আবার বিকাশবাবুর ঘরে ফিরে এলাম। এবার ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, গণেশটা কি কলকাতায় থাকত, না এখানে?

এখানে, বিকাশবাবু বললেন, ওটা যাওয়াতে মিস্টার ঘোষালের যত না কষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট হয়েছে। ওঁর বাবার। ঔর মন ভাল করার জন্যই মিস্টার ঘোষাল এতটা ইয়ে হয়ে পড়েছেন।

ফেলুদা ইতিমধ্যে বিকাশবাবুর টেবিলের উপর থেকে ট্রানজিস্টারটা হাতে তুলে নিয়েছে। মাঝারি সাইজের মাফি রেডিয়ো, চামড়ার খোলস দিয়ে ঢাকা। ফেলুদা নবটা ধরে ঘোরাতে সুইচের কোনও আওয়াজ হল না। তারপর সেটা উলটা দিকে ঘোরাতে খটু করে একটা শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেল।

একী, আপনার রেডিয়ো তো খোলা ছিল।

তাই–তাই বুঝি?

বিকাশবাবুর চেহারাটা যে ঠিক কী রকম হল সেটা আমার পক্ষে লিখে বাঝানো ভীষণ শক্ত। শুধু এটা পরিষ্কার মনে আছে যে বিকাশবাবু খাটের ডাণ্ডটায় হেলান দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় সুইচের আওয়াজটা হওয়া মাত্র পিঠ সোজা হয়ে গিয়ে হেলান দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

এদিকে ফেলুডা রেডিয়োর পিছনে ব্যাটারির খোপের দরজাটা খুলে ফেলেছে। আড়চোখে দেখলাম বিকাশবাবু একটা ঢোক গিললেন। তিনটে ব্যাটারি রেডিয়োটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

আপনার ব্যাটারি তা লিক করেছে, ফেলুদা বলল, বেশ কিছুদিন হল এর আয়ু ফুরিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

বিকাশবাবু চুপ।

রেডিয়ে আপনি শোনেন নিশ্চয়ই, কিন্তু গত বেশ ক'দিন আর শোনা হয়নি। কেন বলুন তো?

কোনও উত্তর নেই।

আপনি যদি কিছু না বলেন, তা হলে আমাকেই বলতে দিন। ফেলুদার গলায় আমার খুব চেনা একটা ধারালো সুর শুনতে পাচ্ছি। –সেদিন মগনলালের কথা শোনার লোভ আপনি সামলাতে পারেননি, তাই না? রেডিয়ো কমিয়ে দিয়ে আপনি নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন ওই দক্ষিণের বারান্দায়। দরজার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনি বৈঠকখানায় কথাবার্তা শুনেছিলেন। আপনি জানতেন মগনলাল মিস্টার ঘোষালকে শাসিয়ে গেছেন। আপনি জানতেন মগনলাল মিস্টার ঘোষালকে ত্রিশ হাজার টাকা অফার করেছেন গণেশটার জন্য। তাই নয় কি?

বিকাশবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেছে। সেই অবস্থাতেই তিনি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।এবার আরেকটা প্রশ্নের ঠিক-ঠিক জবাব দিন তো–ফেলুদা ব্যাটারিগুলো টেবিলের নীচে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।যেদিন অম্বিকাবাবুর ঘরের সিন্দুক থেকে গণেশ চুরি যায়–অর্থাৎ পনেরোই অক্টোবর-সেদিন আপনি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত কী করছিলেন? আপনি রেডিয়া শোনেননি, কারণ রেডিয়া তার পাঁচ দিন আগেই–

বলছি, বলছি–আমাকে বলতে দিন!–বিকাশবাবু যেন মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন ফেলুদা কথা বন্ধ করে বিকাশবাবুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিকাশবাবু দম নিয়ে যেন বেশ কষ্টে তাঁর কথাগুলো বলতে শুরু করলেন–

সেদিন মগনলালের হুমকি শোনার পর থেকেই আমার মনে ভীষণ একটা উৎকণ্ঠার ভাব ছিল। রোজই মনে হচ্ছিল একবার সিন্দুক খুলে দেখি গণেশটা আছে কি না। কিন্তু সে সুযোগ প্রথম এল যেদিন মিস্টার ঘোষাল মছলিবাবাকে দেখতে গেলেন। উনি যাবার দশ

মিনিটের মধ্যেই আমি অম্বিকাবাবুর ঘরে যাই। দেরাজ থেকে চাবি বার করি, করে সিন্দুক খুলি। ,

তারপর?,

ফেলুদাকে প্রশ্নটা করতেই হল, কারণ বিকাশবাবুর কথা থেমে গিয়েছিল।

সিন্দুক খুলে কী দেখলেন। আপনি? ফেলুদা আবার প্রশ্ন করল।

বিকাশবাবু ফ্যাকাসে মুখ করে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলাম–গণেশ নেই।

গণেশ নেই? অবিশ্বাসে ফেলুদার ভুরু ভীষণভাবে কুঁচকে গেছে।

বিকাশবাবু বললেন, আমি জানি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমি শপথ করে বলছি যে সেদিন আমি সিন্দুক খোলার আগেই গণেশ চুরি হয়ে গিয়েছিল। আমি যে কেন এ কথাটা এতদিন আপনাকে বলিনি সেটার কারণ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিস্টার মিত্তির। সত্যি বলতে কী, আমি যে কী অদ্ভুত মানসিক অবস্থার মধ্যে রয়েছি সেটা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

ফেলুদা আবার চায়ের কাপটা তুলে নিয়েছে।

ও সিন্দূকটা কি এমনিতে প্রায়ই খোলা হয়? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

একেবারেই হয় না। আমি যতদূর জানি, এবার উমানাথবাবু আসার পরের দিনই একবার খোলা হয়েছিল–কিছু পুরনো দলিল নিয়ে বাপ আর ছেলের মধ্যে আলোচনা ছিল। এ ছাড়া খুব সম্ভবত আর এক'দিনও খোলা হয়নি।

ফেলুদা চুপ করে বসে আছে। বিকাশবাবুর অবস্থা খুবই শোচনীয় বলে মনে হচ্ছে। প্রায় দু মিনিট এইভাবে থাকার পর ভদ্রলোক আর না পেরে বললেন, আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না মিস্টার মিত্তির?

ফেলুদার গলার স্বর এবার রীতিমতে রুক্ষ।

আই অ্যাম সরি মিস্টার সিংহ–কিন্তু যারা প্রথমবারেই সত্যি কথাটা বলেন না, তাঁদের উপর থেকে সন্দেহটা সহজে মুছে ফেলা যায় না।

৮. আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে

পরদিন সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে, আর রাস্তার অবস্থা দেখলে বোঝা যায় যে সারারাত এই ভাবেই বৃষ্টি পড়েছে। আমি সাড়ে ছটায় উঠেছি। লালমোহনবাবু তখনও বিছানায় শুয়ে গড়িমসি করছেন। চার নম্বর খাট খালি, কারণ সেই মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ কালকেই চলে গেছেন। ফেলুদা যে কখন উঠেছে। জানি না। প্রথমে ভেবেছিলাম যে ও বেরিয়ে গেছে, তারপর বারান্দায় বেরিয়ে দেখি ও এক কোণে রেলিং-এর উপর পা তুলে চেয়ারে বসে নোটবুকের পাতা ওলটাচ্ছে। পায়ের পাতাটা যে বৃষ্টিতে ভিজছে সেদিকে ওর খেয়ালই নেই। ওর পাশে তেপায় টেবিলের উপর একটা খালি চায়ের কাপ, চারমিনারের খোলা প্যাকেট, আর একটা ছোট্ট পাথরের বাটি–যেটাকে ও অ্যাশ-ট্রে হিসেবে ব্যবহার করছে। বৃষ্টির দিনেও যে ঘটে যাবার লোকের অভাব হয় না। সেটা রাস্তার দিকে চাইলেই বোঝা যায়। আর শব্দেরও কোনও কমতি নেই। অবিশ্যি এটা আমি জানি যে এ ধরনের গোলমালে ফেলুদার চিন্তার কোনও ব্যাঘাত হয় না। একবার ওকে জিজ্ঞেস কুরাতে ও বলেছিল, চিন্তা যদি গভীর হয় তা হলে আশেপাশের গালমাল তার তলা অবধি পৌঁছতে পারে না। কাজেই, তুই যেটাকে ডিসটার্বেন্স ভাবছিস, সেটা আমার কাছে আসলে ডিসটার্বেন্স নয়।

লালমোহনবাবু পৌনে সাতটায় বিছানা ছেড়ে উঠে বললেন, স্বপ্ন দেখলুম। আমার সবঙ্গে ছারা বিঁধে রয়েছে, আর আমি সেইভাবেই রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের আপিসে লেখার প্রুফ

আনতে গিয়েছি, আর পাবলিশার হেমবাবু বলছেন।–আপনার ছদ্মনামটা চেঞ্জ করে জটায়ু থেকে শজারু করে দিন-দেখবেন বইয়ের কাটতি বেড়ে গেছে।

আমরা দুজনে যখন মুখটুখ ধুয়ে চা খাচ্ছি, তখন ফেলুদা বারান্দা থেকে ঘরে এসে বলল, লালমোহনবাবু, আপনার কোনও বইয়েতে ঘুড়ির সাহায্যে মেসেজ পাঠানোর কোনও ঘটনা আছে?

লালমোহনবাবু আক্ষেপের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, না মশাই, থাকলে তো খুশিই হতুমি। ওটা যদ্দূর মনে পড়ে নিশাচরের একটা বই থেকে নেওয়া। বোধহয় মানুষের রক্তমাংস?

নিশাচর কে?

ওটা ক্ষিতীশ চাকলাদারের ছদ্মনাম। রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজেরই আরেকজন লেখক। বলছি না–আপনাদের রুকুবাবাজী ওই সিরিজ একেবারে গুলে খেয়েছে।

আপশোস হচ্ছে! ফেলুদা খাটে বসে বলল–এতটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা উচিত ছিল না। আপনাদের ওই সিরিজটাকে। ইয়ে–এক থেকে দশের মধ্যে একটা নম্বর বলুন তো।

সাত।

হুঁ...। শতকরা সত্তর ভাগ লোক ওই নম্বরটা বলবে।

তাই বুঝি?

আর এক থেকে পাঁচের মধ্যে জিজ্ঞেস করলে বলবে তিন, আর ফুল জিজ্ঞেস করলে গোলাপ।

সাড়ে আটটার সময় হোটেলের চাকর হরকিষণ এসে খবর দিল ফেলুদার ফোন এসেছে। শুনে বেশ অবাক হলাম। কে ফোন করছে এই সকালবেলা? একবার ভাবলাম ফেলুদার

সঙ্গে যাই নীচে, কিন্তু এক দিকের কথা শুনে বিশেষ কিছু বোঝা যাবে না বলে ধৈর্য ধরেই বসে রইলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফেলুদা ফিরে এসে বলল, তেওয়ারি ফোন করেছিল। প্রয়াগ বা হরিদ্বারে গত কয়েক মাসের মধ্যে কোনও নামকরা নতুন বাবাজীর আবির্ভাব ঘটেনি। নো মছলিবাবা, নাথিং।

বোঝে! ইনি তা হলে ফোর-টুয়েন্টি? বললেন লালমোহনবাবু।

সেরকম তো অনেক বাবাজীই, লালমোহনবাবু; কাজেই তার জন্যে এঁকে আলাদা করে ভৎসনা করার কিছু নেই। এই প্রতারণার পিছনে আর কোনও গূঢ় সিনস্টার অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে কি না সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন।

আপনি কি জোড়া-তদন্তে জড়িয়ে পড়ছেন নাকি মশাই?

জোড়া কথাটার দুটো মানে হয় জানেন তো? জোড়া মানে ডবল আবার জোড়া মানে যুক্ত। এক্ষেত্রে জোড়া মানে যে কী সেটা এখনও ঠিক জানি না।

তেওয়ারি আর কিছু বললেন না?-আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। ফেলুদা প্রায় চার মিনিটের মতো টেলিফোনে কথা বলেছে, কিন্তু আমাদের এসে যেটা বলল তাতে এক মিনিটের বেশি লাগার কথা না।

ফেলুদা চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল, রায়বেরিলির জেল থেকে হপ্ত তিনেক আগে এক জালিয়াত পালিয়েছে। এখনও নিখোঁজ। চেহারার বর্ণনা মছলিবাবার সঙ্গে খানিকটা মেলে, যদিও দাড়ি-গোঁফ নেই, আর এতটা কালো না।

তা সে তো মশাই মেক-আপের ব্যাপার, বললেন লালমোহনবাবু, একবার দিনের বেলা কাছ থেকে ভাল করে দেখে এলে হয় না? ঘাটে গিয়ে বসে থাকলেও তো হয়। বাবা ঘাটে যান নিশ্চয়ই।

সে গুড়ে বালি। শুধু সন্ধেয় দর্শন দেন, বাকি সময়টা দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে। থাকেন। সেখানে অভয় চক্কোত্তি ছাড়া আর কারও প্রবেশ নেই। খাওয়া-দাওয়া সব ওই। একই ঘরে।–আর নাওয়াটা মাইন্যাস।

আমরা দুজনেই অবাক। বাবাজী স্নান করেন না?

এ-সব তেওয়ারি বললেন?-লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

এত কথা হল তোমার সঙ্গে?–আমি জুড়ে দিলাম।

ফেলুদা আমার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে তিনবার মাথা নেড়ে বলল, পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষায় ফেল। তুই বারান্দায় গেলি আর লক্ষ করলি না যে আমার ভিজে পাঞ্জাবি আর পায়জামা দড়িতে ঝুলছে? ঘরে বসে কাপড় ভেজে শুনেছিস কখনও?

আমি চুন মুখে চুপ মেরে গেলাম।

ফেলুদা এবার যা বলল তা এই- ও চারটেয় উঠে সাড়ে চারটের আগে কেদারঘাটে পৌঁছে অভয় চক্রবর্তীর জন্য অপেক্ষা করে শেষটায় তার দেখা পেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে। —একেবারে মাটির মানুষ। না, মাটি ভুল হল; মোমের মানুষ। গলেই আছেন। আমাকেও গলার অভিনয় করতে হল। বুড়োমানুষের সঙ্গে ছিল করতে ভাল লাগছিল না, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে গোয়েন্দার কিছুটা নির্মম না হলে চলে না। ওঁর কাছেই বাবাজীর হ্যাঁবিটস জানলাম। স্নান করেন না শুনে বোধহয় অজান্তে আমার নাকটা সিটিকে গোসল, তাতে বললেন–মনে যখন ময়লা নেই, তখন দশটা দিন গায়ে জল না ছোঁয়ালে ক্ষতি কী বাবা? জলেরই তো মানুষ, জল থেকেই তো উঠেছেন, আবার জলেই তো ফিরে যাবেন।–গায়ে অশিষ্টে গন্ধ কি না সেটা আর জিজ্ঞেস করলাম না। একটি চেলা নাকি রোজ সকালে আসে একবার করে-মাছের অংশ দিয়ে যায়, যেগুলো সন্ধেবেল বিলি হয়। অভয়বাবু ঘাট থেকে চলে যাবার পরও আমি কিছুক্ষণ ছিলাম। এক পাণ্ডা ওখানে ছাতার তলায় বসে, নাম লোকনাথ! সেদিনের ঘটনাটা দেখেছিল, যদিও গোড়ার দিকটা মিস করেছে। সে যখন

এসেছে তখন বাবাজীর জ্ঞান হয়েছে। পাণ্ডাকে দেখে তার নাম ধরে ডেকে অনেক কিছু বলেছে। বাবাজী যদি ফোর-টুয়েন্টি হয়েও থাকেন, ওঁর যে একটি তুখোড় ম্যানেজার রয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তিনি অভয় চক্কোত্তি নন?

লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। না। অভয় চক্কোত্তি মশাই নিখাদ সর্জন ব্যক্তি; ওঁর মনে সংশয় ঢোকানোর চেষ্টা করেছিলাম। বললাম-প্রয়াগ থেকে সাঁতরে কাশী আসাটা প্রায় অবিশ্বাস্য নয় কি?–তাতে বললেন, সাধনায় কী না হয় বাবা।–এদের বিশ্বাসের জোরেই তো এই যান্ত্রিক যুগেও কাশী আজও কাশী। দেখবে চাঁদের মাটির নীচে মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা হয়ে গেলেও কাশী কাশীই থেকে যাবে।

সাড়ে চারটে নাগাত বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। পাঁচটার সময় আমরা তিনজন হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আজকে ফেলুদা পুরোপুরি টুরিস্ট, কারণ তার কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে। এই দুদিন ওটা ওর সুটকে সেই বন্ধ ছিল। ফেলুদা আর লালমোহনবাবু দুজনেরই ইচ্ছে আজ কচৌরি গলিতে হনুমান হালুইকরের দাকানো গিয়ে রাবড়ি খাবে। আমারও যে ইচ্ছে সেটা বোধহয় না বললেও চলবে।

বিশ্বনাথের পাশেই কচৌরি গলি। এত বছর পরেও তার চেনা দোকানটা খুঁজে বার করতে ফেলুদার কোনও অসুবিধা হল না। দোকানের সামনে বেঞ্চি পাতা রয়েছে, তাতে বসে মাটির ভাঁড় থেকে রাবড়ি খেতে খেতে লালমোহনবাবু সবে বলেছেন।রাবাড়ির আবিষ্কারটা টেলিফোন-টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের চেয়ে কীসে কম মশাই-এমন সময় কালকের সেই লোকটাকে দেখলাম বিশ-ত্রিশ হাত দূরে একটা দাকানের পাশে আমাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আরেকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। মগনলালের ব্যাপারটা মাঝে মাঝে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করি, ফেলুদা ওর কথা না মেনে একটা বেচাল চালালে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হতে পারে সেটাও না-ভাবার চেষ্টা করি, কিন্তু ওই ঝোলা গোঁফওয়ালা

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

লোকটা আবার সব মনে করিয়ে দিচ্ছে। যাই হাক, রাবাড়িটা এত বেশি ভাল যে মগনলালের চেহারাটা মনে পড়া সত্ত্বেও মুখের স্বাদ নষ্ট হল না।

ফেলুদার যা মনের অবস্থা তাতে ও যে খুব বেশিক্ষণ এই ঘিঞ্জি গলিতে থাকতে পারবে না সেটা আমি আগেই জানতাম। কচৌরি গলি থেকে বেরিয়ে মদনপুরা রোড ধরে গোধুলিয়ার মোড় ছাড়িয়ে আমরা বাঙালি-টালার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। দুদিন ঘুরেই এদিকের রাস্তাগুলো বেশ চেনা হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে হাঁটছি, ফেলুদা এদিক ওদিক দেখছে, দু-একবার ক্যামেরার শাটারের শব্দও পেয়েছি। আমি মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছি সেই লোকটা এখনও আমাদের ফলো করছে কি না; কিন্তু বড় রাস্তায় পড়ে অবধি তার আর কোনও পাত্তা পাইনি। শেষটায় ফেলুদাকে বাধ্য হয়েই বলতে হয়, তোর কি ধারণা মগনলাল আমাদের উপর নজর রাখার জন্য মাত্র একটি লোক অ্যাপায়েন্ট করেছে?

এর পর আমি আর পিছনে তাকাইনি।

ওই যে সেই অ্যালুমিনিয়ামের বাসনের দোকান। ওর পরের বর্গ দিকের মোড়টা নিতে হয় অভয় চক্রবর্তীর বাড়ি যাবার জন্য।

মিস্টার মিত্তির! প্রদোষবাবু!

পিছন থেকে ডাক। তিনজনেই থামলাম। গলাটা অচেনা। দুটি ভদ্রলোক, বয়েস বেশি না- একজনের চোখে চশমা, মুখে হাসি। ইনিই বোধহয় ডেকেছিলেন।

আপনার হোটেলে গিয়েছিলাম খোঁজ করতে, ভদ্রলোক বললেন।

কী ব্যাপার? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

আমরা বেঙ্গলি ক্লাবের তরফ থেকে আসছি। আমার নাম সঞ্জয় রায়—ইনি গোকুল চ্যাটার্জি। ইয়ে-আপনাকে কিন্তু আসতে হবে। মানে আপনাদের তিনজনকেই।

কাবুলিওয়ালা?

আপনি জানেন? ভদ্রলোক দুজনই অবাক এবং খুশি।

আপনারা মিস্টার ঘোষালকে নেমন্তন্ন করতে গেসলেন না?

ওরে বাবা-আপনি দেখছি সবই জানেন, হেঃ হেঃ!

উনি তো জানবেনই, অন্য ভদ্রলোকটি সর্দি হওয়া গলায় হেসে বললেন। গোয়েন্দা হিসাবে ফেলুদার খ্যাতি বেঙ্গলি ক্লাব পৌঁছে গেছে।

আপনাদের কার্ডটা নিরঞ্জনবাবুর কাছে রেখে এসেছি। যাবেন কাইণ্ডলি। আমরা সবাই কিন্তু এক্সপেক্ট করে থাকব।

বেশ তো, অন্য কোনও জরুরি ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়লে নিশ্চয়ই যাব।

জড়িয়ে মানে আপনি কি এখানেও কোনও–?

সঞ্জয় রায় আর গোকুল চ্যাটার্জির মাথা একসঙ্গে সামনের দিকে ঝুকে এল। ফেলুদা এরকম অবস্থায় পড়লে একটা হাসি ব্যবহার করে যেটার তিনরকম মানে হয়–হ্যাঁ, না, আর হতেও পারে। এখানেও তাই করল। হাসির মানেটা না বুঝলে বোকা হতে হয়, তাই সঞ্জয় রায় আর গোকুল চ্যাটার্জি দুজনেই বুঝে ফেলেছি। ভাবের একটা হাসি হেসে আবার কাবুলিওয়ালা দেখতে যাবার অনুরোধ জানিয়ে চলে গেলেন।

রাস্তা আর দোকানের বাতি সব জ্বলে গিয়েছে, আকাশের রং রয়েল ব্লু থেকে পামানেন্ট ব্লু ব্ল্যাকের দিকে যাচ্ছে, কীর্তিরাম ছোঁটুরামের পানের দোকানে এই মাত্র ট্রানজিস্টার খোলাতে লতা মঙ্গেশকর সাইকেল রিকশার প্যাঁক-প্যাঁকিনির সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছে, এমন সময় ফেলুদা অ্যানাউন্স করল যে তার ভক্তিভাব জেগেছে, একবার মছলিবাবার দর্শন না পেলেই নয়।

টেলিফোটো লেন্সে থ্রি পয়েন্ট ফাইভে হাফ সেকেন্ড একসপোজার দিয়ে ফেলুদা ভক্তদের পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে ক্যামেরা রেখে স্ট্যাচু হয়ে থাক বলে মছলিবাবার একটা ছবি তুলল। আজ ভক্তদের ভিড় সেদিনের চেয়েও বেশি।-বোধহয় বাবাজী পাঁচ দিন পরে চলে যাচ্ছেন বলে। মগনলালকে দেখলাম না। হয়তো এখনও আসেননি-কিংবা রোজ আসেন। না। আমরা মিনিট কয়েক থেকে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

ডান দিকে মোড় নিয়ে একটা নতুন গলিতে এসে সামনে একটা কালো গোরুকে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লালমোহনবাবু একটা ছোট্ট কাশি কেশে থেমে গেলেন।

কী হল? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

ওটার হাইট কত হবে বলুন তো!

কেন

এথিনিয়াম ইনস্টিটিউশনে হাইজাম্পের রেকর্ড ছিল মশাই আমার। তারপর একবার ডেঙ্গু হয়ে বাঁ হাঁটুটা...

আসুন আমার সঙ্গে।

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে গোরুটার পাঁজরায় দু-তিনটে আলতো চাপড় দিতেই সেটা খুঁট খাট শব্দ করে একপাশে সরে গেল, আর আমরাও তিনজনে দিব্যি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

কোথায় যাচ্ছি মশাই আমরা?-আরও মিনিট পাঁচেক অলিগিলিতে হাঁটার পর লালমোহনবাবু প্রশ্নটা করলেন।

জানি না।

আমি আর লালমোহনবাবু পরস্পরের দিকে চুইলাম। সব সময় যে চাইলেই এ- ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি তা নয়, কিন্তু ঠিক এই সময়টাতে একটা রাস্তার আলো মাথার উপর এসে পড়ায় লালমোহনবাবুর ভ্যাবাচ্যাক ভাবটা বুঝতে অসুবিধা হল না।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটলেও অনেক সময় মাথা খোলে, বলল ফেলুদা, এখানে মাথা খোলাটাই উদ্দেশ্য।

খুলছে কী?

একটা ইঁদুর যদি মানুষ হয়ে যেত তা হলে বোধহয় লালমোহনবাবুর প্রশ্নটা এই ভাবেই করত। ফেলুদা কী উত্তর দিত। জানি না, কারণ ঠিক এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটাতে আমাদের মনটা অন্য দিকে চলে গেল।

এতক্ষণ এ-মোড় ও-মোড় ঘুরে আমরা যে গলিটায় পৌঁছেছিলাম সেটা একটু বিশেষ রকম নির্জন। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আশেপাশের বাড়িগুলোর ভিতর থেকে মানুষের গলার স্বর পেয়েছি, বাচ্চার কান্নার শব্দ পেয়েছি, রেডিয়ো থেকে গানের আওয়াজ পেয়েছি। এবারের গলিটায় দূর থেকে ভেসে আসা মন্দিরের ঘণ্টা ছাড়া আর কোনও শব্দই নেই। একটু এগোতে শোনা গেল তার সঙ্গে আরেকটা শব্দও একটানা এক তালে হয়ে চলেছে- ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ...

লালমোহনবাবু আমাদের দুজনের মাঝখানে হাঁটছিলেন; শব্দটা শুনে দুদিকে হাত বাড়িয়ে আমাদের কোটের আস্তিন ধরে মৃদু টান দিয়ে হাঁটার স্পিড কমিয়ে দিলেন। তারপর ফিস ফিস করে বললেন হাইলি সাসপিশাস্।

ফেলুদা নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ওটা সাসপিশাসি কিছু না; পানের তবক তৈরি হচ্ছে। সাস পিশাস হচ্ছে, ওইটে।

এবার দেখলাম একটি লোককে আমাদের থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে। সে একটা মোড় ঘুরে সবেমাত্র এ গলিটায় ঢুকেছে।

লোকটা এগিয়ে এসে আমাদের দেখেই যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার মুখে আলো পড়েনি, তাই এতদূর থেকে তাকে চেনা যাবে না; রাস্তার আলোটা তাঁর পিছন দিকে। সেই আলো তার পিঠে পড়াতে একটা প্রকাণ্ড লম্বা ছায়া সারা গলি জুড়ে প্রায় আমাদের পা অবধি পৌঁছে গেছে।

ছায়াটা অদ্ভুতভাবে দুলছে। লোকটা মাতাল নাকি?

ফেলুদা টেলিফোটা সমেত ক্যামেরাটা চোখে লাগাল।

শশীবাবু।

নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা বিদ্যুদ্বেগে দৌড়ে গেল সামনের দিকে। তিনজন প্রায় একসঙ্গেই গিয়ে পৌঁছলাম শশীবাবুর কাছে। ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখে চেয়ে আছেন। শশীবাবু ফেলুদার দিকে, তার ঠোঁট দুটো ফাঁক দেখে মনে হয় তিনি কিছু বলতে চাইছেন।

কিছু বলবেন?–ফেলুদা ঝুকে পড়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

হাঁ...হাঁ...

কী হয়েছে শশীবাবু? কী বলতে চাইছেন আপনি?

সিং, সিং, সিং।

শশীবাবুর দেহটা সামনের দিকে এলিয়ে পড়ল।

তার পিঠে আলো পড়েছে।

সেই আলোতে দেখলাম শশীবাবুর পিঠে একটা ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে তার পাঞ্জাবির অনেকখানি ভিজিয়ে দিয়েছে।

৯. গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেব

গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেব রে।

ফেলুদা এ ধরনের কথা আগে কোনওদিন বলেনি, কিন্তু এবার যে অবস্থায় পড়েছে, তাতে এটা বলা বোধহয় খুব অস্বাভাবিক নয়।

আজ সপ্তমী। সোমবার। এখন সকাল। শশীবাবু খুন হয়েছেন দুদিন আগে। আমরা সকালে চা রুটি ডিম খাওয়া সেরে আমাদের হোটেলের ঘরে যে যার খাটে বসে আছি। একটুক্ষণ আগে তেওয়ারি ফোন করে জানিয়েছেন যে শশীবাবুর ছোট ছেলে নিতাইকে নাকি অ্যারেস্ট করা হয়েছে। নিতাই খারাপ ছেলে এটা আগেই শুনেছি। তার সঙ্গে নাকি বাপের অনবরত খিটিমিটি লাগত। শশীবাবু নাকি প্রায়ই ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখাতেন! তাই ছেলের পক্ষে শেষ পর্যন্ত বাপকে খুন করাটা অস্বাভাবিক নয়। নিতাই কিন্তু খুন স্বীকার করেনি। সে নাকি সেদিন সন্ধেবেলা চৈতগঞ্জের একটা সিনেমায় হিন্দি ছবি দেখছিল। তার শার্টের পকেটে টিকিটের আধখানা পাওয়া গেছে। যে ছুরি দিয়ে শশীবাবুকে খুন করা হয়েছিল সেটা নাকি পাওয়া যায়নি।

মৃত্যুর দিন সন্ধ্যা ছাঁটার মধ্যে শশীবাবু চক্ষুদানের কাজ শেষ করে দেন। বিকাশবাবু পুলিশকে বলেছেন যে কাজটা শেষ করেই শশীবাবু বিকাশবাবুর কাছে যান হোমিওপ্যাথিক ওষুধ চাইতে, কারণ তার নাকি আবার নতুন করে জ্বর এসেছিল। বিকাশবাবু ওষুধ দেন, শশীবাবু তখনই ওষুধ খেয়ে বাড়ি যাবার জন্য বেরিয়ে যান। পথেই তাকে খুন করা হয়।

মাঝে মাঝে বোধহয় এ ধরনের একটা ধাক্কা খাওয়া ভাল।—ফেলুদা আবার কথা বলছে। আমি জানি কথাটা ঠিক আমাদের উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে না। ফেলুদা যেটা করছে। তাকে ইংরেজিতে বলে থিংকিং অ্যালাউড। – বেশ লাগছে নিজেকে একটা সাধারণ স্তরের মানুষ বলে মনে করতে। —লালমোহনবাবু, আজ কাবুলিওয়ালা দেখতে যাবেন তো? এরা শুনেছি বেশ ভাল অভিনয় করে।

হ্যাঁ তা আপনি গেলে, মানে আপনি যদি...

আর কাল যাব টারজান। পরশু জঞ্জীর; তরুণ্ড রফু চক্কর। আর দুগাবাড়িটাও একবার দেখিয়ে আনব্য আপনাদের। দেখবেন ওখানকার বাঁদরগুলো ফেলুমিত্তিরের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।

সত্যি সন্ধ্যাবেলা আমরা কাবুলিওয়ালা দেখতে বেঙ্গলি ক্লাবে হাজির হলাম, আর সত্যই দেখলাম ওরা বেশ ভাল অ্যাকটিং করে।

অন্য বাড়িতে পুজো হয়। গোটা পাঁচেক ঠাকুর দেখে আমরা দুর্গর্বাড়িতে গেলাম। লালমোহনবাবু মন্দিরের বাইরে রইলেন, কারণ বাঁদর জিনিসটা নাকি ওঁর খাঁচার বাইরে ভাল লাগে না। বললেন, ব্যাসদেব, থুড়ি—বাল্মীকিদেব যে কেন জানোয়ারটাকে জাতে তুলেছেন তা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। যারা লাঠির খোঁচা না খেলে নাচতে পারে না তারা করবে। সেতুবন্ধন? ছেঃ!—আর আমার গপপোকে বলা হয় গাঁজাখুরি!

দুপুরে মিস্টার ঘোষাল ওঁদের বাড়িতে খেতে বলেছিলেন ২ ফেলুদা হোটেল থেকে ফোন করে বিকাশবাবুকে অ্যাপলজি জানিয়ে দিল। আমরা হাটেলেই খেলাম! ফেলুদা দু বেলাই হাতের রুটি খায়। আজ হঠাৎ একগাদা ভাত খেয়ে বিছানায় শুয়ে এক ঘুমে সাড়ে চারটি বাজিয়ে দিল। পরে বুঝেছিলাম যে ঝড়ের আগে প্রকৃতির যে একটা মাদামারা ভাব হয়, এ হল তাই; কিন্তু ফেলুদাকে কক্ষনও এরকম অকেজো আর ঝিমধরা অবস্থায় দেখিনি বলে। মনটা ভীষণ খারাপ লাগছিল।

লালমোহনবাবু অবিশ্যি ঠিক অকেজো ছিলেন না; তাঁর খাতায় তিনি একটা গল্পের খসড়া আরম্ভ করে দিয়েছেন গতকাল থেকে। দু লাইন লিখছেন আর সিলিং-এর দিকে চাইছেন। খালি একবার আমার দিকে ফিরে বললেন,মুমূর্ষুতে কী আডারে হ্রস্ব-উ দীর্ঘ-ঊ আসছে বলবে কাইন্ডলি?

শেষ পর্যন্ত টারজান দি এপ ম্যানও যাওয়া হল, কিন্তু ফেলুদার আর পুরো ছবিটা দেখা হল না। পুরো কেন বলছি-মেট্রো-গোল্ডউইন মেয়ারের নামের পর ছবির নামটা সবে পদায় পড়েছে, এমন সময় ফেলুদা দেখি সিট ছেড়ে উঠে পড়েছে।

তোপসে, তোরা থাক। আমার একটু কাজ আছে।

কিছু বলার আগেই ফেলুদা হাওয়া।

আমার মনের অবস্থা অদ্ভুত। ছবিটাও ভাল লাগছে ফেলুদার মধ্যে হঠাৎ কেন জানি উৎসাহ জেগে উঠেছে, সেটাও ভাল লাগছে, অথচ ও যে কীসের জন্য চলে গেল সেটা ভেবে পাচ্ছি না।

আটটার সময় ছবি শেষ হল; রিকশা নিয়ে হোটেলে ফিরলাম সোয়া আটটায়। ঘরে এসে দেখি ফেলুদা খাটে বসে খাতা খুলে ভীষণ মনোযোগ দিয়ে কী সব যেন হিসাব করছে। আমাদের দেখে বলল, তোরা খেয়ে নিস। আমার জন্য এক পেয়ালা কফি পাঠিয়ে দিতে বলেছি।

তুমি খাবেই না?

পেট ভরা। তা ছাড়া তেওয়ারির কাছ থেকে একটা জরুরি টেলিফোন আসছে।

আজ অষ্টমী বলে হোটেলে লুচি মাংস ছিল, রান্নাও ভাল হয়েছিল, কিন্তু পাছে তেওয়ারির ফোন আসার আগে খাওয়া শেষ না হয় তাই সব কিছু গোগ্রাসে গিলতে হল।

ফোনটা এল আমাদের খাওয়া শেষ হওয়ার প্রায় আধা ঘণ্টা পরে। এবার আমি ফেলুদার কাছে না থেকে পারলাম না। ফেলুদা যা বলল তা হচ্ছে এই–

বলুন মিস্টার তেওয়ারি...হাঁ...ভেরি গুড.না না, এখন কিছু করবেন না, একদম শেষ মুহূর্তে...হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো গোড়ায় এত গণ্ডগোল লেগেছিল...হ্যাঁ-আর ইয়ে-ওই বাড়িটার খোঁজ করেছিলেন?...ভেরি গুড.ঠিক আছে, কাল দেখা হবে...গুড নাইট।

লালমোহনবাবু আমার সঙ্গে নীচে যাননি। সিনেমা থেকে ফেরার পথেই আমাকে বলেছিলেন, তোমার দাদার আজকের তিড়িংবাজির ঠেলায় আমার প্লটের খেই হারিয়ে গেছে; আবার নতুন করে সব সাজাতে হবে। ঘরে ফিরে এসে দেখি তিনি খাতা খুলে মুখ বেজার করে বসে আছেন। ফেলুদা ফিরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু। করে দিল।

লালমোহনবাবু খাতা বন্ধ করে বললেন, খুব খারাপ হচ্ছে এটা, জানেন তো? না পারছি আমার গল্প এগোতে, না পারছি আপনার কেসের সঙ্গে পাল্লা দিতে। এদিকেও একটু ছিটেফোটা ছাড়ুন। আমাদেরও তা ব্রেন বলে একটা জিনিস আছে। একটু খাটাবার সুযোগ দিন!

কোনও আপত্তি নেই, ফেলুদা একটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল, আপনাকে পাঁচটা সুতো দিচ্ছি, তা দিয়ে আপনি যত খুশি জাল বুনুন।

সুতো?

অ্যাফ্রিকার রাজা, শশীবাবুর সিং, হাঙরের মুখ, এক থেকে দশ, আর মগনলালের বজরা।

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তার চেয়ে বললেই পারতেন চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, আর রুমালের মা। সে বরং ঢের সহজ হত।

কিন্তু একটা কথা আমাদের দিতে হবে আপনাদের-ফেলুদা হঠাৎ সিরিয়াস-কাল থেকে আর কোনও ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না।

একটা করেই যা জবাব পেলুম-আবার প্রশ্ন?

ফেলুদা লালমোহনবাবুর রসিকতা অগ্রাহ্য করে বলে চলল, কাল থেকে আমাকে হয়তো মাঝে মাঝে বেরোতে হতে পারে, তবে আপনাদের সঙ্গে না। আপনারা দুজনে যেখানে খুশি যেতে পারেন; আমার মনে হয় না। তাতে কোনও রিস্ক আছে। যদি তেমন বুঝি তা হলে আগে থেকেই বাইরে যেতে বারণ করব।..আর লালমোহনবাবু সাঁতার জানেন তো?

সাঁত- ?

জলে নেমে ভেসে থাকতে পারেন তো?

হাঁ হ্যাঁ-ফর্টি-ফোরে হেদোতে-

ওতেই হবে। –অবিশ্যি সাঁতারের যে প্রয়োজন হবেই তা বলছি না।

পরের দিন নবমী! সকালে চা খেয়ে আমি আর লালমোহনবাবু বেরিয়ে পড়লাম। ফেলুদা বলল ও হাটেলেই থাকবে, কারণ ফোন আসতে পারে। লালমোহনবাবুর এক্কা চড়ার শখ–এদিকে কাশীতে আজকাল ঘোড়ার গাড়ি মানে বেশির ভাগ টাঙ্গা। অনেক খুঁজে শেষে একটা এক্কা পাওয়া গেল। সোনারপুরা রোড দিয়ে হিন্দু ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত গিয়ে দুগাকুণ্ড রোড দিয়ে ফেরার পথে মন্দির মসজিদ প্রাসাদ যা কিছু পড়ে সব দেখে সাড়ে এগারেটার সময় আমরা হোটেলে ফিরে এসে দেখি ফেলুদা বালিশ বুকের তলায় রেখে খাটের ওপর শুয়ে খুব মন দিয়ে তার তোলা কয়েকটা ছবির কোয়ার্টর সাইজ এনলার্জমেন্ট দেখছে; পরশু। বেঙ্গলি ক্লাবে যাবার পথে ও ক্রাউন ফোটো স্টোর্সে ওর ফিল্মটা দিয়ে। গিয়েছিল।

বিকেলের দিকে তেওয়ারির টেলিফোন এল; ফেলুদা মিনিট দুয়েকের মধ্যেই কথা শেষ করে উপরে চলে এল। বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই আমি আর লালমোহনবাবু মণিকর্ণিকার শ্মশান দেখে এলাম। লালমোহনবাবু যাবার ও ফেরার পথে বার তিনেক বললেন, আজ আর কেউ ফলো করছে বলে মনে হচ্ছে না।

ফিরে এসে শুনলাম ফেলুদা হাটেলেই ছিল। শংকরী নিবাস থেকে বিকাশবাবু ফোন করেছিলেন; মিস্টার ঘোষাল জানতে চেয়েছেন ফেলুদা হাল ছেড়ে দিয়েছে কি না।

তুমি কী বললে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর এল, না।

পরদিন ভোর ছটায় উঠে দেখি ফেলুদা নেই। বিছানা পরিপাটি করে চাদর দিতে ঢাকা, তার উপর ছাই ফেলার সেই পাথরের বাটি, আর তার তলায় এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা–ফোন করব।

তার মানে আমাদের হাটেলেই অপেক্ষা করতে হবে। তাতে আপত্তি নেই, কেবল ফেলুদা যেন নিরাপদে থাকে, খুব বেশি রকম বেপরোয়া কিছু করে না বসে। ফেলুদা যদিও এ বিষয়ে কিছু বলেনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস শশীবাবুকে মগনলালের লোক খুন করেছে। শশীবাবু নিশ্চয়ই ফেলুদার চেয়ে বড় শত্রু নয় মগনলালের। তা হলে ফেলুদাকেই বা–

আর ভাবব না। যা থাকে কপালে। কেবল মনে সাহস রাখতে হবে।

চা খাবার সময় লালমোহনবাবু বললেন, মগনলাল সেদিন গণেশের কথা যা বললেন, সেটা তোমার দাদা বিশ্বাস করে হাত-পা গুটিয়ে নিলেই পারতেন।

আমি বললাম, গুটিয়ে তো নিয়েই ছিল; হঠাৎ সেদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে কী যে হল।

শেষটায় টারজান যে এরকম সর্বনাশ করবে তা কে জানত বলো।

দুপুর পর্যন্ত ফেলুদার কোনও ফোন এল না। খাবার পরে লালমোহনবাবু আর কিছু করার না পেয়ে শেষটায় গণেশ চুরি সম্পর্কে ওর নিজের কী ধারণা সেটা আমায় বললেন।

বুঝলে তপেশ, গণেশটা আসলে চুরিই যায়নি। ওটা অম্বিকাবাবু আফিং-এর ঝোঁকে সিন্দুক থেকে বার করেছেন, আর তারপর নেশা কেটে যাবার পর ওটার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন।

আমি বললাম, কিন্তু তা হলে এখন সেটা আছে কোথায়?

ওঁর। তালতলার চুটিটা দেখেছি? ওঁর পায়ের চেয়ে চটি জোড়া কতখানি বড় সেটা লক্ষ করেছি? একজন বুড়োমানুষ চটি পায়ে দিয়ে বসে থাকলে কে আর চটি খুলে তার ভেতরে সার্চ করতে যাবে বলো?

আমার একটু সন্দেহ হল। বললাম, আপনার নতুন গল্পে এরকম একটা ব্যাপার থাকছে বুঝি?

লালমোহনবাবু মুচকি হেসে বললেন, ঠিক ধরেছ। তবে আমার গল্পে গণেশের বদলে একটা দু হাজার ক্যারেটের হিরে।

দু হাজার –আমার চক্ষু চড়কগাছ। –পৃথিবীর সব চেয়ে বড় হিরে স্টার অফ আফ্রিকা, কত ক্যারেট জানেন?

কত?

পাঁচশো। আর কোহিনূর হল মাত্র একশো দশ।

লালমোহনবাবু গভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, দু হাজার না হলে গল্প জমবে না।

বিকেলে সাড়ে চারটার সময় হরকিষণ এসে বলল আমার টেলিফোন এসেছে। ঝড়ের মতো ছুটে নীচে গিয়ে নিরঞ্জনবাবুর অ্যাসিসট্যান্টের হাত থেকে ফোনটা প্রায় ছিনিয়ে নিলাম।

কে, ফেলুদা?

শোনা, -গম্ভীর চাপা গলা—খুব মন দিয়ে শোন। দশাশ্বমেধের দক্ষিণে ওর ঠিক পরের ঘাট হল মুনশী ঘাট, আর তার পরে হল রাজা ঘাট। শুনছিস?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

মুনশী আর রাজার মাঝামাঝি একটা নিরিবিলি জায়গা আছে। একটা ঘাটের ধাপ শেষ হয়ে আরেকটার ধাপ যেখানে শুরু হচ্ছে তার মাঝামাঝি।

বুঝেছি।

দেখিবি বৈদ্যনাথ সালসার একটা বিজ্ঞাপন আছে হিন্দিতে লেখা, পাথরের দেওয়ালের গায়ে। আর তার নীচেই একটা মস্ত বড় চৌকো খুপরি।

বুঝেছি।

তোরা দুজন ওখানে গিয়ে পৌঁছবি ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। খুপরিটার সামনে অপেক্ষা করবি। আমি ছটা নাগাত পৌঁছব।

বুঝেছি।

আমি ছদ্মবেশে থাকব।

কথাটা শুনে আমার বুকটা এমন ধড়াস করে উঠল যে আমি কিছু বলতেই পারলাম না। ফেলুদার ছদ্মবেশ মানে নাটকের ক্লাইম্যাক্স।

শুনছিস?

হাঁ হ্যাঁ।

আমি ছটা নাগাত তোদের মিট করব।

ঠিক আছে।

না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবি।

ঠিক আছে। তুমি ঠিক আছ তো?

ছাড়ছি।

খুট শব্দে ওদিকের টেলিফোনটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা যেন আবার কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

১০. দশাশ্বমেধে আজ দাসেরা

দশাশ্বমেধে আজ দাসেরার দিন ভিড় হবে বলে আমরা ঠিক করলাম অভয় চক্রবর্তীর বাড়ির রাস্তা দিয়ে আগে কেদার ঘাট যাব। সেখান থেকে সিঁড়ি ধরে উত্তরে হাঁটলে প্রথমেই পড়বে। রাজা ঘাট। লালমোহনবাবু আজ সকালে হোটেলের কাছেই একটা ডাক্তারি দোকান থেকে ষোলো অক্ষরের নামওয়ালা কী একটা বড়ি কিনে এনে এরই মধ্যে দুবার দুটো করে খেয়ে নিয়েছেন। বললেন। গতকাল রাত্রে নাকি ওঁর আধঘুম অবস্থায় বার বার দাঁত কপাটি লেগে যাচ্ছিল, এখন সেটা একদম সেরে গেছে।

সাহস যে খানিকটা বেড়েছে সেটা বুঝলাম বড় রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে প্রথম গলিটায় ঢুকেই। সামনেই একটা ষাঁড়-গোরু নয়, ষাঁড়-রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে ঘাড়

বেঁকিয়ে দেখছে। লালমোহনবাবু সটান এগিয়ে গিয়ে অ্যাঁই ষণ্ড, হ্যাট হ্যাট বলে সেটাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে পাশ কাটিয়ে দিব্যি চলে গেলেন। আমি ভয় পাইনি, তবে মজা দেখবার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম; লালমোহনবাবু আমাকে এসো তপেশ, কিছু বলবে না বলে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

অভয়বাবুর বাড়ির বাইরে আর ভিতরে বেশ ভিড় দেখলাম। কেন ভিড় সেটা ভাবতে গিয়েই খেয়াল হল যে আজই তো মছলিবাবার চলে যাবার দিন। আমরা এসেছি তৃতীয়াতে, আর আজ হল দশমী। যাক, তা হলে ভাসান ছাড়াও একটা বড় ঘটনা আছে আজকে।

বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তার মধ্যে আমাদের হোটেলের এক মুখচেনা ভদ্রলোককে দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম মছলিবাবা কেদারঘাট থেকে যাবেন কি না। ভদ্রলোক বললেন, না-বোধহয় দশাশ্বমেধ। তা হলে আমাদের একটু দূরে থেকে দেখতে হবে ঘটনাটা। লালমোহনবাবুর তাতে আপত্তি নেই। বললেন, ভক্তদের চাপে চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে দেখার চেয়ে একটু দূর থেকে দেখা ঢের ভাল।

কেদার ঘাট থেকে উত্তর দিকে হাঁটা শুরু করে মিনিট পাঁচেক লাগল রাজাঘাট পৌঁছতে। ঘাটের পাশে সারি সারি উঁচু বাড়ি থাকার জন্য এদিকটা থেকে রোদ সরে যায় অনেক আগেই। বর্ষার পরে জল এগিয়ে এসেছে, বাড়ির ছায়া জলের কিনারা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে আর রোদ থাকবেই না। আর তার পরেই ঝাপ করে নামবে অন্ধকার। ঘাটের পাশে এক জায়গায় সারি সারি নীকে, তার উপরে ঢাঙা বাঁশের মাথায় কার্তিক মাসের বাতি জ্বলছে। উত্তরে বোধহয় দশাশ্বমেধ ঘাট থেকেই একটা শব্দের ঢেউ ভেসে আসছে—বুঝতে পারছি বহু লোকের ভিড় জমেছে সেখানে। তার মধ্যে ঢাকের শব্দ পাচ্ছি, আর মাঝে মাঝে পটকার শব্দ আর হাউইয়ের হুশ।

রাজা ঘাটের ধাপ শেষ হয়ে ভিজে মাটি শুরু হল। মিনিটখানেক হাঁটার পর বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়ল। বৈদ্যনাথ সালসা। প্রায় এক-মানুষ বড় বড় এক-একটা হিন্দি অক্ষর। পরে

ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করাতে ও বলেছিল সালসা কথাটা নাকি পোর্তুগিজ; ওটার মানে হল একরকম রক্ত পরিষ্কার-করা ওষুধ।

জায়গাটা সত্যি খুব নিরিবিলি। শুধু তাই না-এখান থেকে দশাশ্বমেধ দিব্যি দেখা যাচ্ছে। ঘাটের ধাপে মানুষের ভিড় আর জলে নৌকো আর বজরার ভিড়।

দুর্গ মাঈকি জয়।

একটা ঠাকুর ভাসান হয়ে গেল। বজরার মাথায় তুলে খানিকটা নদীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেই হল। দু নীকে ফাঁক করে ভাসান দেওয়ার ব্যাপার এখানে নেই।

রোদ চলে গেল, কিন্তু ঘাটের গণ্ডগোল এখন বেড়েই চলবে। ছটা বাজতে কুড়ি। লালমোহনবাবু হাতের ঘড়িটা দেখে সবে বলেছেন তোমার দাদার টেলিফোকাসটা থাকলে খুব ভাল হত, এমন সময় একটা নতুন চিৎকার শোনা গেল—

গুরুজী কি জয়! মছলিবাবা কি জয়! গুরুজী কি জয়!

বেনারসের ঘাটে একরকম আটকোনা বুরুজ থাকে, যার উপর অনেক সময় ছাতার তলায় পাণ্ডারা বসে, পালোয়ানরা মুগুর ভাঁজে, আবার এমনি সাধারণ লোকও বসে। আমাদের ঠিক t মনেই হাত পঞ্চাশেক দূরে সেইরকম একটা বুরুজ জর্ল থেকে চার-পাঁচ হাত উঁচুতে উঠে য়েছে-সেটা এখন খালি। সেইরকম বুরুজ দশাশ্বমেধে অনেকগুলো আছে। তার মধ্যে যটা আমাদের দিকে, তার উপর কিছু লোক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। গুরুজী কি দয় শুনেই তাদের মধ্যে একটা ব্যস্ত ভাব দেখা গেল। তারা এখন সবাই ঘাটের সিঁড়ির দিকে চেয়ে রয়েছে।

এবার দেখলাম একটা প্রকাণ্ড দল সিঁড়ি দিয়ে নেমে বুরুজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দলের মাথায় যিনি রয়েছেন তিনি আর কেউ নন-স্বয়ং মছলিবাবা। টকটকে লাল লুঙ্গিটা এখন

মালকোচা দিয়ে ধুতির মতো করে পরা। গায়ের লাল চাদরের উপর হলদে রং দেখে বুঝলাম বাবা অনেক গাঁদা ফুলের মালা পরে আছেন।

বুরুজ এবার প্রায় খালি হয়ে গেল। শুধু দুজন রইল, তারা বাবার হাত ধরে তাকে উপরে তুলল। বাবার মাথা এখন সবাইয়ের উঁচুতে।

বাবা এবার দু হাত তুললেন ভক্তদের দিকে ফিরে। কী বললেন, বা কিছু বললেন কি না। সেটা এতদূর থেকে বোঝা গেল না।

এবার বাবা হাত তোলা অবস্থাতেই বুরুজের উলটোদিকে এগিয়ে গেলেন। বাবার সামনে এখন গঙ্গা। পিছন থেকে আবার জয়ধ্বনি উঠল—জয় মছলিবাবা কি জয়?

সেই জয়ধ্বনির মধ্যে বাবা গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন।

একটা অদ্ভুত আওয়াজ উঠল। ভক্তদের মধ্যে। লালমোহনবাবু সেটাকে সমস্বরে বিলাপ বললেন। বাবাকে কিছুক্ষণ জলের মধ্যে সাঁতরাতে দেখা গেল। তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লালমোহনবাবু বললেন, ডুব সাঁতারে পৌঁছে যাবে পাটন–কী থ্রিলিং ব্যাপার ভাবতে পার?

আরও একটা থ্রিলিং ব্যাপারে আমাদের প্রায় হার্টফেলা হয়ে যাবার অবস্থা হল যখন দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে চোখ ঘুরিয়ে দেখি এই ফাঁকে কখন জানি একটি লোক এসে আবছা! অন্ধকারে নিঃশব্দে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটার বাঁ হাতে একটা বাঁশের লাঠি। মাথায় পাগড়ি, মুখে গোঁফ-দাড়ি, গায়ে লম্বা শার্টের উপর ওয়েস্ট কোট, নীচে পায়জামা, আর তারও নীচে একজোড়া ডাকসাইটে কাবলি জুতো।

কাবুলিওয়ালা।

কাবুলিওয়ালা ডান হাতটা অল্প তুলে আমাদের আশ্বাস দিল।

ফেলুদা। কাবুলিওয়ালার ছদ্মবেশে ফেলুদা! এই মেক-আপই সেদিন ব্যবহার করেছিল। বেঙ্গলি ক্লাবের ত্রিদিব ঘোষ।

ওয়ান্ডার–

লালমোহনবাবুর প্রশংসা মাঝপথে থামিয়ে দিল ফেলুদার ঠোঁটের আঙুল।

কী ঘটতে যাচ্ছে জানি না, ছদ্মবেশের কী দরকার জানি না, অপরাধী কে বা কারা জানি না, তবু ফেলুদা যদি চুপ করতে বলে তা হলে চুপ করতে হবেই। এটা আমিও জানি, আর লালমোহনবাবুও অ্যাদ্দিনে জেনে গেছেন।

ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে। আমাদের চোখও সেইদিকে চলে গেল।

দূর থেকে একটা বজরা ভেসে আসছে ঘাটের দিকে। তার মাথায় একটা বাতি জ্বলছে। বড় বজরা। বজরার ছাতে চার-পাঁচজন লোক। কাউকেই চেনা যায় না। এতদূর থেকে সম্ভব নয়।

দুর্গা মাঈকি জয়! দুর্গা মাঈকি জয়?

আরেকটা প্রতিমা আসছে ঘাটে। সিঁড়ি দিয়ে নামানো হচ্ছে। হ্যাজাক লণ্ঠনের আলো পড়ে ঠাকুর মাঝে মাঝে ঝলমল করে উঠছে। দূর থেকেও চিনতে অসুবিধা নেই। এটা ঘোষালদের ঠাকুর।

ফেলুদার সঙ্গে আমরাও পাথরের মতো দাঁড়িয়ে বিসর্জন দেখতে লাগলাম।

বিরাট প্রতিমা বজরার মাথায় চড়ে গেল। বজরা এগোতে শুরু করল আরও গভীর জলের দিকে।

তারপর দেখলাম প্রতিমাটা একবার ঝাঁকি দিয়ে উপরে উঠে চিত হয়ে বজরার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝপাং শব্দটা এল কিছু পরে—যেমন ক্রিকেট মাঠে বল মারাটা চোখে দেখার কিছু পরে শব্দটা আসে।

হঠাৎ মনে হল শশীবাবুর তুলির টান এখন জলের তলায়। হয়তো এর মধ্যেই সব ধুয়ে মুছে গেছে।

মছলিবাবাকে দেওয়া গাঁদা ফুলের মালাগুলো এখন ভেসে যাচ্ছে আমাদের সামনে দিয়ে।

যে বজরাটা দূর থেকে নদীর ধার দিয়ে আসছিল, সেটা এখন দশাশ্বমেধ ছাড়িয়ে আমাদের দিকে আসছে।

মগনলালের বজরা। মগনলালের বিশাল দেহটা দেখতে পাচ্ছি। বজরার ছাদে। সে বাবু হয়ে বসে আছে, সঙ্গে আরও চারজন লোক।

ফেলুদার ডান হাতটা তার কোমরের কাছে, বাঁ হাতটা এখনও লাঠিটাকে ধরে আছে। আলো কমে এসেছে, কিন্তু তাও আমি বাঁশের একটা গাঁটের নীচে মুঠো করে ধরা বাঁ হাতটা দেখতে পাচ্ছি।

সেদিনের গলিতে শোনা ধুপ ধুপ শব্দটা আবার শুনতে পাচ্ছি। এখন সেটা হচ্ছে আমার বুকের ভিতরে।

আমার গলা শুকিয়ে আসছে।

আমার চোখ ওই বাঁ হাতটা থেকে সরাতে পারছি না।

ফেলুদার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখটা লম্বা।

কাবুলিওয়ালার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখটা কাটা।

ফেলুদার বাঁ হাতের কবজির কাছে একটা তিল।

কাবুলিওয়ালার বাঁ হাতের কবজির কাছে কোনও তিল নেই। ...

এ লোকটা ফেলুদা নয়।

কে এসে দাঁড়িয়েছে কাবুলিওয়ালা সেজে আমাদের পাশে?

লালমোহনবাবু কি জানেন তাঁর পাশে কে দাঁড়িয়ে আছে?

তিনি কি বুঝেছেন ও ফেলুদা নয়?

বজরাটা আমাদের সামনের বুরুজের কাছাকাছি চলে এসেছে। এখান থেকে বুরুজটা প্রায় পঁচিশ গজ দূরে। বজরা এখন তারও প্রায় পঁচিশ গজ উত্তর দিকে। ব্যবধান কমে আসছে।

কাবুলিওয়ালা আমাদের ইশারা করল খুপরিটার ভিতর ঢুকে যেতে। লালমোহনবাবু নিজে ঢুকে আমার হাত ধরে টেনে নিলেন। এক হাতের বেশি গভীর নয় খুপরিটা। আমরা এখান থেকে সবই দেখতে পাচ্ছি, যদিও বাইরের লোকে আমাদের দেখতে পাবে না।

বজরা এবার থামো-থামো।

বুরুজের ঠিক পিছনে জলে কী যেন নড়ছে।

একটা লোকের শুধু মাথাটা জলের উপর উঠল। লালমোহনবাবু হাতটা বাড়িয়ে আমার কোটের আস্তিনটা খামচে ধরলেন।

একটা লোক বজরা থেকে প্রায় নিঃশব্দে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

লোক নয়—ছোকরা।

রুকুর বন্ধু সূরয।

সূরয সাঁতরে এগিয়ে এল বুরুজের দিকে।

বুরুজের পিছনে জল থেকে এবার লোকের মাথাটা উঠতে শুরু করে কাঁধ অবধি বেরিয়ে এল। এ কি স্বপ্ন, না সত্যি? ও যে মছলিবাবা! দু হাতে জাপটে কী যেন ধরে আছে।

সূরয তার দিকেই এগিয়ে এসেছে। বজরার ছাতের লোকেরা ওদের দুজনের দিকেই দেখছে!

এবার আরেকটা-একটা নয়, পর পর দুটো-ধাঁধা লাগানো জিনিস ঘটল। মছলিবাবা তার হাত থেকে এবড়ো-খেবড়ো বলের মতো জিনিসটা ছুঁড়ে ঘাটের দিকে ফেলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কাবুলিওয়ালা হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে সামনের দিকে ছুটে গিয়ে জিনিসটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে ডান হাতে পকেট থেকে রিভলবার বার করে বজরার দিকে ত্যাগ করে দাঁড়াল।

সেই মুহূর্তেই মগনলাল একলাফে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম তারও হাতে একটা রিভলবার এসে গেছে। তার পাশে লোকগুলোও উঠে দাঁড়িয়েছে, আর মনে হচ্ছে ওদের হাতেও অস্ত্র রয়েছে।

এদিকে আমাদের মাথার উপরেও পায়ের শব্দ পাচ্ছি। ধুপ ধাপ করে দু-তিনটে সশস্ত্র পুলিশ বোধহয় বৈদ্যনাথ সালসার পিছনের চত্বরটা থেকে লাফিয়ে আমাদের দু পাশে পড়ল।

তার পরেই শুরু হল কান ফটানো গুলির শব্দ। একটা গুলি আমাদের খুপরির ঠিক পাশে দেওয়ালের গায়ে লাগল। জখম দেওয়ালের গুঁড়ো গঙ্গার হাওয়ায় সোজা এসে ঢুকল লালমোহনবাবুর নাকের ভিতর।

হ্যাঁচ্চো!

ওদিকে মগনলালের হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে বেরিয়ে গেছে। আর তার পরেই এক তাজ্জব ব্যাপার। ওই হিপোপটেমাসের মতো লোকটা বজরার উলটাদিকে ছুটে গিয়ে এক বিকট চিৎকার দিয়ে হাত দুটো মাথার উপর তুলে একটা বিরাট লাফ দিয়ে গঙ্গায় পড়ে চতুর্দিকে জলের ফোয়ারা ছিটিয়ে দিল।

কিন্তু কোনও লাভ নেই। দুটো নৌকো এরই মধ্যেই বজরার পাশে এসে পড়েছে, তাতে পুলিশ বোঝাই।

আর মছলিবাবা?

তিনি সূর্যকে বগলদাবা করে জল থেকে উঠে আসছেন।

এবার তিনি কাবুলিওয়ালার দিকে ফিরে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ, তেওয়ারিজী।

আর কাবুলিওয়ালা মছলিবাবার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে জল থেকে টেনে তুলে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার মিত্তির।

আমি আর লালমোহনবাবু মাটিতে বসে পড়লাম; না হলে হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম।

সূরয একজন পুলিশের হাতে চলে গেল। ফেলুদা কাছে আসতে বুঝলাম তার মেক-আপটা কী অসাধারণ হয়েছে–যদিও এখন শরীরের কোনও কোনও জায়গায় কালো রঙের ফাঁক দিয়ে চামড়ার আসল রংটা বেরিয়ে পড়েছে।

শ্বেতির মতো লাগছে না রে তোপ্সে?

ওয়াভারফুল!–বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা এবার তেওয়ারির দিকে ফিরে বলল, আপনার লোককে বলে দিন তো–জিপে তোয়ালে আর আমার জামাকাপড়গুলো রয়েছে–চট করে নিয়ে আসুক।

১১. বিজয় দশমী

বিজয় দশমী, রাত পৌনে দশটা। ঘোষালবাড়ির একতলার বৈঠকখানা। যাঁরা ঘরে রয়েছেন তাঁরা হলেন-গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্তির, লালমোহন গাঙ্গুলী, সাব-ইনসাপেক্টর তেওয়ারি, অম্বিকা ঘোষাল, উমানাথ ঘোষাল, উমানাথবাবুর স্ত্রী, রুক্মিণীকুমার ঘোষাল, বিকাশ সিংহ, আর আরও সব যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন যাঁদের নাম জানি না, আর আমি-তপেশরঞ্জন মিত্র। এ ছাড়া ঘরের দরজার বাইরে থেকে উঁকি মারতে দেখছি তিনজন লোককে—দারোয়ান ত্রিলোচন পাণ্ডে, বেয়ারা বৈকুণ্ঠ আর বুড়ে চাকর ভরদ্বাজ।

কোলাকুলি শেষ, মিষ্টি শেষ-অন্তত প্লেটে শেষ, যদিও কারুর কারুর চোয়াল এখনও নড়ছে। যেমন ফেলুদার। ঠাকুর ভাসান হয়ে যাবার পর বাড়ির লোকের মন খারাপ হয়ে যায়; এখানেও তাই হয়েছিল। কিন্তু এখন আবার এক ঠাকুর চলে গিয়ে আরেক ঠাকুর ফিরে পাবার আশায় সকলের মুখেই বেশ একটা হাসিহাসি উত্তেজনার ভাব। এটা বলে রাখি যে গণেশ পাওয়া গেছে কি না সেটা কিন্তু এখনও জানা যায়নি। যেটা জানা গেছে সেটা হল। মছলিবাবার ঘটনা। আজ বিকেল চারটের সময় ভক্তের দল আসার আধা ঘণ্টা আগে অভয়বাবুর বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পুলিশ মছলিবাবাকে অ্যারেস্ট করে। বাবাজী আসলে ছিলেন। সেই রায়বেরিলির জেল থেকে পলাতক জালিয়াত। তা ছাড়াও তিনি ছিলেন। মগনলালের একজন স্যাঙাৎ। তার আসল নাম নাকি পুরুন্দর রাউত, বাড়ি পূর্ণিয়া। লোকটা অনেক’দিন কলকাতায় ছিল, মনুমেন্টের তলায় হাত সাফাইয়ের খেলা দেখানো থেকে শুরু করে অনেক রকমের অদ্ভুত কাজ করে শেষটায় জালিয়াতি ধরে। অ্যারেস্টের এক ঘণ্টার মধ্যে বেঙ্গলি ক্লাবের কাছ থেকে ধার করা মেক-আপের সরঞ্জামের সাহায্যে মছলিবাবার চেহারা নিয়ে ফেলুদা ভক্তদের সামনে হাজির হয়। তার আগেই অবিশ্যি পুরুন্দর রাউত পুলিশের চাপে পড়ে সব কথা ফাঁস করে দিয়েছিল। আজ গঙ্গার ঘাটে যে দুর্ধর্ষ নাটকটা মগনলাল প্ল্যান করেছিল সেটাও পুরন্দর বলে দিয়েছিল। আসলে

মছলিবাবাকে মগনলালই খাড়া করেছিল। তার পিছনে যে কী সাংঘাতিক শয়তানি ফন্দি ছিল সেটা পরে ফেলুদার কথা থেকে জানা যায়।

সবাই মুখ বন্ধ করে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে, সকলেরই দৃষ্টি ফেলুদার দিকে। লালমোহনবাবু যে কেন মাঝে মাঝে হেসে উঠছেন জানি না; হয়তো বিকাশবাবু ওকে জোর করে সিদ্ধি খাইয়েছেন বলে। সিদ্ধি খেলে নাকি হাসি পায়।

ফেলুদা জল খেয়ে হাতের কাচের গেলাসটা আওয়াজ বাঁচিয়ে খুব সাবধানে পিতলের কাশ্মীরি টেবিলটার উপর রেখে বলল, মগনলালই মছলিবাবার সৃষ্টিকতা এ কথা আমি আপনাদের আগেই বলেছি। মছলিবাবা অন্তর্যামী, মছলিবাবা অলীকিক ক্ষমতার অধিকারী—এ ধরনের কয়েকটা ধারণা রটাতে পারলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। কেদার ঘাটে মছলিবাবাকে এনে ফেলার আগে অভয় চক্রবর্তী এবং লোকনাথ পাণ্ডা সম্বন্ধে দু-একটা কথা জেনে নেওয়া মগনলালের মতো লোকের পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না। বাকি কাজটা সম্ভব হয়েছিল। অভয়বাবুর অন্ধ ভক্তির জোরে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বাসের জোরে।

ফেলুদা থামল। লালমোহনবাবু হাসবার জন্য মাথা পিছনে হেলিয়ে মুখটা খুলতেই আমি ওর কনুইয়ে খোঁচা মেরে ওকে থামালাম। ঘরের আর প্রত্যেকটি লোক হাঁ করে ফেলুদার কথাগুলো গিলছে। ফেলুদা বলে চলল—

মগনলালের সঙ্গে সম্প্রতি তার বাড়িতে বসে আমার কিছু কথা হয়েছিল। মগনলাল বলেছিল গণেশটা তার কাছে আছে, এবং উমানাথবাবু নিজে নাকি সেটা তাকে বিক্রি করেছেন।

অ্যাঁ!–চোখ রাঙিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। উমানাথ ঘোষাল। আপনি বিশ্বাস করেছিলেন তার কথা?

রহস্যের একটা নতুন দিক হিসাবে কথাটা শুনতে, যে খুব খারাপ লেগেছিল তা বলব না। কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন মগনলাল তদন্ত বন্ধ করার জন্য আমাকে একটা মোটা ঘুষ অফার করল, তখন মনে একটা খটকা লাগল! বন্ধ করার একটা কারণ অবিশ্যি মগনলাল বলেছিল, কিন্তু সেটা আমার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। তার কথা সত্যি হলে বরং আপনি আমাকে ঘুষ আফার করতে পারতেন–কারণ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে গেলে সেটা আপনার পক্ষে মোটেই সুবিধের হত না! অথচ আপনি আমাকে নিজে থেকে অনুসন্ধান চালাতে বলেছেন।

নিজে থেকে, প্রতিধ্বনি করলেন লালমোহনবাবু, হাঃ হাঃ–নিজে থেকে।

ফেলুদা লালমোহনবাবুর পাগলামো অগ্রাহ্য করে বলে চলল–

তখনই আমার প্রথম সন্দেহ হয় যে তা হলে হয়তো গণেশটি আপনাদের বাড়িতেই কোথাও রয়ে গেছে, এবং মগনলাল কোনও উপায়ে কোনও একটা সময়ে সেটা পাবার অংশ করছে। বাড়িতে রয়েছে, অথচ সিন্দুকে নেই–তা হলে গেল কোথায় জিনিসটা? সেই সঙ্গে আবার এটাও মনে হল যে এ বাড়ির সঙ্গে মগনলালের একটা যোগসূত্র না থাকলে সেই বা কী করে আশা করছে। গণেশটা পাবার?

এই সব যখন ভাবছি, তখন একটা কারণে হঠাৎ সন্দেহটা গিয়ে পড়ল মিস্টার সিংহের উপর; কারণ আমি জানতে পারলাম যে তিনি একটা জরুরি সত্য আমার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছিলেন। জেরার ফলে বিকাশবাবু স্বীকার করলেন যে তিনি দর্শই অক্টোবর লুকিয়ে লুকিয়ে মগনলালের সঙ্গে উমানাথবাবুর কথাবার্তা শুনেছিলেন। শোনার পর থেকে তার মনে গণেশটা সম্পর্কে একটা উদ্বেগ থেকে যায়। মিস্টার ঘোষাল যেদিন মছলিবাবাকে দেখতে যান, সেদিন আর থাকতে না পেরে বিকাশবাবু দোতলায় অম্বিকাবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর দেরাজ থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলেন। খুলে দেখেন গণেশ নেই।

গণেশ তখনই নেই? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন উমানাথবাবু। তার মানে তার আগেই চুরি হয়ে গেছে?

চুরি না, ফেলুদা বলল। ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়েছে।–তার হাত দুটো প্যান্টের পকেটে। চুরি না। একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি গণেশটিকে মগনলালের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেটিকে লুকিয়ে রেখেছিল।

ক্যাপ্টেন স্পার্ক।–বলে উঠল রুক্মিণীকুমার।

সবাইয়ের দৃষ্টি রুকুর দিকে ঘুরে গেল। সে ঘরের এক কোণে একটা দরজার পাশে পদার্গ হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক বলেছ। ক্যাপ্টেন স্পার্ক, ওরফে আমাদের রুকুবাবু। –আচ্ছা, ক্যাপ্টেন স্পার্ক, সেদিন যখন তোমার বাবার সঙ্গে একজন মোটা ভদ্রলোক এ ঘরে বসে কথা বলছিলেন–

রুকু ফেলুদার কথা শেষ না হতেই চেঁচিয়ে উঠল—ডাকু গণ্ডারিয়া -ক্যাপ্টেন স্পার্ক তাকে বার বার বোকা বানায়।

সে যখন কথা বলছিল, তুমি কি তখন ওই পাশের ঘর থেকে শুনছিলে?

রুকু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, শুনছিলাম তো। আর তক্ষুনি তো সিন্দুক খুলে গণেশ নিয়ে লুকিয়ে রাখলাম। না হলে তো ও নিয়ে নিত।

ভেরি গুড, ফেলুদা বলল। তারপর অন্যদের দিকে ফিরে বলল, আমি ক্যাপ্টেন স্পার্ককে গণেশের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাতে ও বলেছিল। গণেশ পাওয়া যাবে না। করুণ সেটা রয়েছে আফ্রিকার এক রাজার কাছে! কথাটার মানে আমি তখন বুঝতে পারিনি। শেষে বুঝলাম একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে-প্টয়তাল্লিশ বছরের পুরনো টার্জনের একটা ফিল্ম দেখতে গিয়ে।

ফেলুদা থামতেই চারিদিক থেকে-সে কী! অ্যাঁ? টার্জনের ছবি? ইত্যাদি অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে শোনা গেল! ফেলুদা সরাসরি উত্তর না দিয়ে আবার রুকুর দিকে তাকিয়ে বলল, ক্যাপ্টেন স্পার্ক, টারজানের ছবির এক্কেবারে শুরুটা কী সেটা মনে করে বলতে পার তুমি!

পারি, বলল রুকু, মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ার প্রেজেন্টস–

ঠিক কথা-মিস্টার তেওয়ারি, দেখুন তো আমরা মেট্রো-গোল্ডউইনের খেলা কিছু দেখাতে পারি কি না।

তেওয়ারি তার চেয়ারের নীচ থেকে একটা খবরের কাগজের মোড়ক নিয়ে সেটা খুলে তার থেকে একটা অদ্ভুত জিনিস বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিল। তার উপরে বিজলির ঝাড়ের আলোটা পড়তেই বুঝলাম সেটা একটা জলে নষ্ট হয়ে যাওয়া মাটির তৈরি হাঁ-করা সিংহের মাথা! ফেলুদা মাথাটা হাতে তুলে ধরে বলল, এই দেখুন আফ্রিকার পশুরাজ তথা দুর্গারি বাহনের মাথা। এই সিংহের হাঁ-এর মধ্যে গণেশ লুকিয়ে রেখেছিল। ক্যাপ্টেন স্পার্ক। তার ধারণা ছিল বিসর্জনের পর গণেশ ভাসতে ভাসতে চলে যাবে সমুদ্রে, আর সেখানে একটি হাঙর সেটাকে গ্রাস করবে, আর স্পার্কই আবার সেই হাঙরকে হারপুন দিয়ে মেরে গণেশটাকে পুনরুদ্ধার করবে। তাই না, ক্যাপ্টেন স্পার্ক?

তাই তো, বলল রুকু।

আর মছলিবাবার প্ল্যান ছিল তিনি ঠাকুর ভাসানের আগে নিজে জলে ঝাঁপ দেবেন। তারপর কিছু দূর সাঁতরে গিয়ে আবার ডুব সাঁতারে ফিরে আসবেন ঘাটের দিকে-এসে নীকের আড়ালে অপেক্ষা করবেন। তারপর ভাসানের পরমুহূর্তে আবার ডুব দিয়ে সিংহের মাথাটি চাড় দিয়ে খুলে নিয়ে চলে যাবেন মুনশীঘাট আর রাজঘাটের মাঝামাঝি একটা নির্জন জায়গায়। ততক্ষণে মগনলালের বজরাও এসে যাবে সেইখানে। ব্যস-বাকি কাজ তো সহজ।

উমানাথবাবু বললেন, কিন্তু বাবাজী যে দস্যেরার দিনে যাবেন, সে তো তার ভক্তরাই ঠিক করে দিয়েছিল। আর গণেশ কোথায় আছে সে খবরই বা বাবাজী জানবেন কী করে? আর মগনলালই বা জানবে কী করে?

দুটোর উত্তরই খুব সহজ, বলল ফেলুদা।তৃতীয়ার দিনে বাবাজী তাঁর ভক্তদের জিজ্ঞেস করেন এক থেকে দশের মধ্যে একটা নম্বর বলতে। যথারীতি অধিকাংশ উত্তরই হয় সাত। এটাই নিয়ম। ফলে হয়ে গেল তিনে সাতে দশ-অর্থাৎ দিসেরা। আর সিংহের মুখে গণেশ লুকোনোর কথাটা ক্যাপ্টেন স্পার্ক সবাইকে না বললেও, তার বন্ধু সূরযকে নিশ্চয়ই বলেছিল, তাই না, ক্যাপ্টেন স্পার্ক?

রুকু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তার ভুরু কুঁচকে গেছে। সে ছোট্ট করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল।

ফেলুদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, শয়তান সিং সত্যিই শয়তান সিং। সূরায্যের পুরো নাম সূরফলাল মেঘরাজ। সে মগনলালের ছাট ছেলে। যাকে বলে বাপকা বেটা। থাকত মানমন্দিরের কাছে মগনলালের দুটো বাড়ির একটাতে। ওটায় ফ্যামিলি থাকত। অন্যটায় থাকত মগনলাল নিজে। সূরযই তার বাপকে খবরটা দেয়, এবং তার পরেই মগনলাল তার বিরাট চক্রান্তটি খাড়া করে।

বিশ্বাসঘাতক! —বলে উঠল রুকু।

এতক্ষণে অম্বিকাবাবু মুখ খুললেন—

সিংহের মাথাটা তো টেবিলের উপর রেখে দিয়েছে, কিন্তু গণেশ কই?

ফেলুদা মাথাটাকে আবার হাতে তুলে নিল। তারপর তার হাঁ-করা মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে টান দিয়ে যে জিনিসটা বার করল সেটা গণেশ নয় মোটেই। সেটা তার আঙুলের ভগায় লেগে থাকা চটচটে একটা সাদা জিনিস।

ক্যাপ্টেন স্পার্ক গণেশটাকে আটকাতে একটা আশ্চর্য সহজ উপায় বার করেছিল।

চিকলেট!–বলে উঠল রুক্মিণীকুমার।

হ্যাঁ, চুইং গাম, বলল ফেলুদা, সেই চুইং গামের খানিকটা এখনও রয়ে গেছে, কিন্তু গণেশ আর এখানে নেই।

ফেলুদার এই এক কথাতেই ঘোষাল বাড়ির সকলের মুখ কালো হয়ে গেল। উমানাথবাবু কপাল চাপড়ে বলে উঠলেন, তা হলে এত করে কী হল মিস্টার মিত্তির? গণেশই নেই?

ফেলুদা সিংহের মাথাটা আরেকবার নামিয়ে রেখে বলল, আমি আপনাদের আশায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবার জন্য আপনাদের এখানে ডাকিনি, মিস্টার ঘোষাল। গণেশ আছে। সেটা কোথায় বলার আগে আমি আপনাদের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আপনাদের একজন খুব পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যুর কথা! শশীভূষণ পাল।

তাকে তো তার ছেলে মেরেছে বলে উঠলেন। উমানাথবাবু, সেই নিয়েছে নাকি গণেশ?

ব্যস্ত হবেন না, বলল ফেলুদা, আমার কথাটা আগে মন দিয়ে শুনুন। আমি যা বলতে যাচ্ছি সেটা প্রমাণসাপেক্ষ, এবং সে প্রমাণ আমরা পাব বলেই আমার বিশ্বাস।

ঘরের প্রত্যেকটি লোক আবার স্তব্ধ হয়ে ফেলুদার দিকে দেখছে। লালমোহনবাবু আর জোরে হাসছেন না, কিন্তু সব সময়েই তার মুখে হাসি লেগে রয়েছে। আর কেন জানি মাঝে মাঝে ডান হাত দিয়ে নিজের কপালে চাঁটি মারছেন।

ফেলুদা বলল, সিংহের মুখের মধ্যে যদি গণেশ লুকোনো থাকে তা হলে সেটা দেখে ফেলার সব চেয়ে বেশি সুযোগ ছিল শশীবাবুর। বিশেষ করে যেদিন তিনি সিংহের মুখের বাইরে এবং ভিতরে তুলির কাজ করছিলেন সেই দিন। অথাৎ পঞ্চমীর দিন! অর্থাৎ যেদিন তিনি খুন হন। সেদিন আপনারা সন্ধ্যায় বাড়ি ছিলেন না–মনে আছে কি? ত্রিলোচন বলেছে আপনারা বিশ্বনাথের মন্দিরে আরতি দেখতে গিয়েছিলেন।

উমানাথবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন। ফেলুদা বলল, আমরা পুলিশের কাছ থেকে জেনেছি যে শশীবাবু সেদিন আবার অসুস্থ বোধ করাতে তাঁর কাজ শেষ করে বিকাশবাবুর কাছে ওষুধ চাইতে গিয়েছিলেন। এ কথা বিকাশবাবুই পুলিশকে বলেছিলেন। শশীবাবু ওষুধ নিয়ে বাড়ি চলে যান। আমরা ত্রিলোচনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে শশীবাবু যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিকাশবাবুও বেরিয়েছিলেন। তিনি কেন বেরিয়েছিলেন সেটা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

বিকাশবাবু গভীর গলায় বললেন, এটা জিজ্ঞেস করার কারণ কী বুঝতে পারছি না। যাই হাক, মিস্টার মিত্তির যে প্রশ্নটা করলেন তার উত্তর হচ্ছে-আমি সিগারেট কিনতে বেরিয়েছিলাম।..আরও কিছু প্রশ্ন আছে কি মিস্টার মিত্তিরের?

হ্যাঁ, আছে। –সিগারেট কিনে বাড়ি ফিরতে এক ঘণ্টার উপর সময় লাগল কেন আপনার, বিকাশবাবু?

তার কারণ আমি গঙ্গার ঘাটে একটু হাওয়া খেতে গোসলাম। কোন ঘাট জানতে চান তো তাও বলছি। হরিশ্চন্দ্র। সোনারপুরা রোডের ডাক্তার অশোক দস্তুর সঙ্গে সেখানে দেখা হয়, মিনিট দশেক কথাও হয়। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।

আপনার হরিশ্চন্দ্র ঘাটে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি অবিশ্বাস করছি না বিকাশবাবু। আপনার সেখানে যাবার একটা বিশেষ কারণ ছিল। সেটায় আমরা আসছি। এক্ষুনি; তার আগে ক্যাপ্টেন স্পার্ককে আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে। ক্যাপ্টেন স্পার্ক, তুমি কি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট খুদে রক্ষিতকে বলেছিলে সিংহের মুখে গণেশ লুকিয়ে রাখার কথা?

ও তো বিশ্বাসই করেনি, বলল রুকু।

জানি। সেইজন্যেই ও সিন্দুক খুলে দেখতে গিয়েছিল রুকূর কথা সত্যি কি না। যখ দেখল। সত্যি, তখন থেকেই ওর লোভ হয়। গণেশটার উপর। সেটা আপনিই চলে আসে ওর

হাতে যখন শশীবাবু গণেশটা পেয়ে বাড়িতে আর কাউকে না পেয়ে বিকাশবাবুর হাতে সেটা জমা দিতে চায়। কিন্তু বিকাশ সিংহ তো জিনিসটা এভাবে পেতে চাননি; শশীবাবু যে পরের দিনই সব কথা ফাঁস করে দেবেন! তাকে খতম না করতে পারলে তো বিকাশবাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। তাই তিনি শশীবাবুকে ধাওয়া করেন। যাবার পথে শ্রীধর ভ্যারাইটি স্টোর্স থেকে একটি ছোরা কেনেন। তাই দিয়ে গণেশ মহল্লার অন্ধকার গলিতে শশীবাবুকে নির্মমভাবে হত্যা করেন; তারপর হরিশ্চন্দ্র ঘাটে গিয়ে রক্তাক্ত ছুরিটা গঙ্গায়–

মিথ্যে! সর্বৈব মিথ্যে! প্রত্যেকটা কথা মিথ্যে!–বিকাশবাবুর এরকম অদ্ভুত চেহারা কোনওদিন দেখব কল্পনা করিনি। তার চোখ দুটো আর কপালের রাগ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে-গণেশ যদি আমি নেব তো সে গণেশ কোথায়? কোথায় সে গণেশ?

আর এক’দিন পরে হলে হয়তো সে গণেশ থাকত না। আপনি নিশ্চয়ই মগনলালকে বিক্রি করে দিতেন। কিন্তু পুজোর কাঁটা দিন আপনার বাড়ি থেকে বেরোনো সম্ভব হয়নি।-তাই আপনাকে গণেশ লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল।

মিথ্যে কথা।

তেওয়ারিজী! ফেলুদা দারোগাসাহেবের দিকে হাত বাড়াল। তেওয়ারি এবার আরেকটা জিনিস ফেলুদার হাতে তুলে দিল।

বিকাশবাবুর রেডিয়ো।

ফেলুদা রেডিয়েটাকে চিত করে ব্যাটারির খুপরির ঢাকনাটা খুলে তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করল একটা লম্বা হিরে-বসানো আড়াই ইঞ্চি সোনার গণেশ।

পরমুহূর্তেই অম্বিকাবাবুর বিশাল তালতলার চটির একটা পাটি গিয়ে সজোরে আছড়ে খো বিকাশবাবুর গালে।

সব শেষে শুনলাম রুকুর রিনারিনে চিৎকার–

বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক!

***

ঘোষালদের বাড়িতে তারিফ আর ভূরিভোজ ছাড়া আর যে জিনিসটা পাওয়া গেল, সেটা রয়েছে এখন ফেলুদার পকেটে একটা খামের মধ্যে। আমরা মদনপুরা রোড দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছি। লালমোহনবাবুর সিদ্ধির নেশা ছুটেছে কি না জানি না। হতে পারে ফেলুদার চোখ রাঙানি আর আমার চিমটির চোটে তিনি নিজেকে সামলে রেখেছেন।

কীর্তিরাম ছোটুরামের পানের দোকানের সামনে থামতে হঠাৎ আবার বেসামালভাবে হেসে উঠলেন লালমোহনবাবু!

কী হল মশাই, ফেলুদা বলল, আপনাকে রাঁচি পাঠাতে হবে নাকি? এত বড় একটা ঘটনা আপনার হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে?

আরে দুর মশাই, লালমোহনবাবু কোনও রকমে হাসি থামিয়ে বললেন, কী হয়েছে সে তো জানেন না। রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের তেষট্টি নম্বর বই–রিক্ত-হীরক রহস্য বাই জটায়ু–সেদিন দেখলুম। রুকুর তাকে। হিরো একটা হিরে লুকিয়ে রাখছে। হাঁ-করা এক কুমিরের স্ট্যাচুর মুখের মধ্যে–ভিলেন যাতে না পায়। ভাবতে পারেন, আমারই লেখা বই আর আমিই কিনা ফেল মেরে গেলুম, আর ফেলুমিত্তির হয়ে গেলেন হিরো!

ফেলুদা কিছুক্ষণ লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, আপনি ভুল করছেন। লালমোহনবাবু। তার চেয়ে বরং বলুন আপনি আপনার কলমের জোরে এমন একটি রহস্য ফেদেছেন যে বাস্তবে তার সামনে পড়ে ফেলু মিত্তিরের গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেবার উপক্রম হয়েছিল। কাজেই আপনিই বা হিরো কম কীসে?

সাত রকম মশলাওয়ালা তবক দেওয়া পানটা চার আঙুলের ঠেলা দিয়ে মুখে পুরে লালমোহনবাবু বললেন, যা বলেছেন মশাই—জটায়ুর জবাব নেই।